বাংলাদেশের উপজাতি

সুগত চাকমা

বাংলাদেশের উপজাতি

সুগত চাকমা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন বাংলা একাডেমীর মূল লক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও একাডেমী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মননশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অবদান দেশ-বিদেশের বিদ্বৎসমাজে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশনার সংখ্যা চার হাজারের অধিক। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যে এমন কিছু বই আছে যা ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও প্রকাশিত হয় নি। শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর অনেক বই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কিছু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এই অভিলক্ষ্যে ১৯৯১ থেকে পুনর্মুদ্রণযোগ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব একাডেমীর 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পে'র অধীনে সম্পন্ন হয়ে আসছে।

জনাব সুগত চাকমা প্রণীত 'বাংলাদেশের উপজাতি' বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের উপজাতি গ্রন্থখানি বাংলাদেশের উপজাতিদের ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসেই, পাংখুয়া, বম, খ্যাং, চাক, খুমি, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং এবং সিলেটের খাসিদের সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি উপজাতীয়দের জীবন প্রণালী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকসমাজ ও গবেষকদের কাজে লাগবে।

এই গ্রন্থ আগের মতো পাঠকসমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিকটুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা — জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

বহু উপজাতির বাস এ দেশে। তাদের জীবনযাপন অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এরা কারা? কেমন এদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, জীবনাচরণ? এসব বিষয় নিয়ে এই বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচিপত্র

চাকমা	১–১৮
চাকমাদের দল–উপদল ও সামাজিক কাঠামো	১৯–২৫
মারমা	২৬–৩৪
ত্রিপুরা	৩৫–৪৪
তঞ্চঙ্গ্যা	৪৫–৪৯
ম্রো	৫০–৬০
বম	৬১–৬৩
লুসেই ও পাংখুয়া	৬৪–৬৭
খ্যাং	৬৮–৭০
খুমি	৭১–৭৩
চাক	৭৪–৭৮
গারো	৭৯–৮৩
খাসি	৮৪–৮৮

চাকমা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে গিরি, ঝর্না, নদী এবং অরণ্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ব্রিটিশ যুগে ১৮৬০ সালে Chittagong Hill Tracts District নাম নিয়ে এই নতুন অঞ্চলটির সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বের মানচিত্রে এই অঞ্চলের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫ থেকে ২৩°৪৫ এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১°৪৫ থেকে ৯২°৫২। জন্মলগ্নে এর আয়তন ছিল ৬৭৯৬ বর্গমাইল। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ফলে এর বর্তমান আয়তন দাঁড়িয়েছে ৫০৯৩ বর্গমাইলে।

এ অঞ্চলের প্রধান উপজাতি চাকমারা। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্টে প্রদত্ত পরিবারগুলোর হিসাব থেকে জানা যায় যে, এখানকার ৪,৬০,২৭০ জন উপজাতীয়দের মধ্যে এখানে তাদের জনসংখ্যা হলো প্রায় ২,২৪,২৭৯ জন এবং তাদের অন্যতম শাখা তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা হলো ১৮,৪৪০ জন। এই হিসাবে এই অঞ্চলে চাকমাভাষীদের জনসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২,৪২,৭১৯ জন। অবশ্য এই হিসাবে কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরস্থ তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে হিসাবে ধরা হয় নি। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে প্রতি পরিবারে এখানে ৫.৭৫ জন ধরা হয়।

চাকমারা বাইরের লোকদের কাছে চাকমা হিসেবে পরিচিত হলেও তারা কিন্তু নিজেদেরকে বলে চাঙমা (Changma)। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুণাচলে চাকমারা বাস করে। মিজোরামে চাকমাদের নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিল

রয়েছে। বার্মার আরাকান অঞ্চলে আকিয়াব জেলায়ও চাকমাদের কিছু লোক রয়েছে। তারা সেখানে দৈংনাক (Doingnak) নামে পরিচিত।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। স্যার H. H. Risley সাহেব তাঁর লিখিত Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে চাকমাদের দেহে শতকরা ৮৪.৫০ ভাগ মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। ধর্মীয় দিক থেকে চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। নৃতাত্ত্বিকভাবে তারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক হলেও তাদের ভাষা কিন্তু বাংলা এবং অহমিয়ার মতো হিন্দু-আর্য (Indo-Aryan) শাখাভুক্ত। চাকমাদের লেখার জন্য নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এ-বর্ণগুলোর সাথে বর্মী ও অহম বর্ণের মিল আছে। এই চাকমা বর্ণগুলো চাকমাদের ইতিহাস (বিজগ), ধর্মীয় শাস্ত্র (আঘরতারা), চিকিৎসা শাস্ত্র (তান্ত্রিক শাস্ত্র) ইত্যাদি লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতীতে 'গেংগুলি' নামক এক শ্রেণীর চারণ কবি চাকমাদের গ্রামে বেহালা বাজিয়ে গান করতো। তাদের গীতের নাম 'উভাগীত'। আর তারা গানের সুরে যে সমস্ত উপাখ্যান বা পালাগান শুনাতো চাকমারা সেগুলোকে "পালা" বলতো। বর্তমানে চাকমাদের গ্রামদেশ বাদে আর কোথাও গেংগুলিদের বড় একটা দেখা যায় না। অতীতে তারা প্রেমধর্মী উপাখ্যান ব্যতীত চাকমাদের ইতিহাসের উপরও কাহিনীভিত্তিক গান শোনাতো। এমনি একটি পালাগানের নাম 'চাদিগাঙ ছাড়া পালা' অর্থাৎ চট্টগ্রাম ছাড়ার পালাগান। এই পালাগানে চাকমাদের আদিবাসস্থান চম্পকনগর থেকে বেরিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয় এবং তৎপরে বিশেষ কারণে চম্পকনগর ও চট্টগ্রাম ত্যাগের কাহিনী আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ :

অতীতে চাকমারা চম্পকনগর নামে একটি রাজ্যে বাস করতো। এক সময় সেই রাজ্যের এক রাজার বিজয়গিরি ও সমরগিরি নামে দু'টি ছেলে ছিল। বড় ছেলে বিজয়গিরি পিতার জীবদ্দশায় দক্ষিণ দিকে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করেন। অতঃপর ফেরার পথে তিনি যখন চট্টগ্রাম পৌছেন তখন শুনতে পেলেন যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং ছোট ভাই চম্পকনগরের রাজা হয়েছেন। এ সংবাদে তিনি খুবই মর্মাহত হয়ে চম্পকনগরে আর না ফিরে নতুন বিজিত রাজ্যে রাজত্ব করার

মনস্থির করেন। তিনি তাঁর অনুগত সৈন্যদের নিয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে সাপ্রেইকূলে চলে যান এবং তাঁর অনুগত সৈন্যদেরকে স্থানীয় রমণী বিয়ে করার অনুমতি দেন। কালে তাদের সাথে চম্পকনগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং চম্পকনগর ও তার বাসিন্দারা কালের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আজকের চাকমাদের বিশ্বাস তারা বিজয়গিরির সেইসব আরাকান বিজয়ী সৈন্যদেরই বংশধর।

আরাকানিদের ইতিহাসেও চাকমাদের উপরোক্ত জনপ্রিয় কিংবদন্তিটির সমর্থন পাওয়া যায়। আরাকানিরা চাকমাদেরকে শাক্যবংশীয় লোক মনে করে। তাই তারা চাকমাদেরকে সাক্ (Sak) বা থেগ (Thek) বলে। স্যার Arthur P. Phayre ১৮৮৩ সালে তাঁর History of Burma গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় আরাকানিদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ১৫৪৬ সালে আরাকান-রাজ মেং বেং (Meng Beng) যখন বর্মীদের সাথে একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন হঠাৎ আরাকানের উত্তর দিকস্থ ত্রিপুরার দিক থেকে একজন 'সাক্‌রাজা' (চাকমা রাজা) আরাকান আক্রমণ করে রামু পর্যন্ত অধিকার করেন। আরাকান-রাজ অবশ্য পরে চট্টগ্রাম পুনর্দখল করতে সক্ষম হন।

চাকমারা যে এককালে কক্সবাজার জেলার রামু পর্যন্ত অধিকার করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখনও রামুর দু'মাইল দূরে বাকখালী নদীর তীরে চাকমাদের নামানুসারে 'চাকমাকূল' নামে একটি স্থান রয়েছে। ঐ স্থানের পার্শ্বস্থিত স্থানের নামও ফতে খাঁ নামক একজন চাকমারাজার নামানুসারে 'ফতেখাঁকূল' বলা হয়। চাকমাকূলের অপর দিকে বাকখালী নদীর ওপারে চাকমারাজাদের নামানুসারে 'রাজারকূল' নামক স্থানটি অবস্থিত। অনেকে তাই চাকমাকূল অঞ্চলটিকেই বিজয়গিরির বর্ণিত সাপ্রেইকূল (সাকপ্রে-কূল) বলে মনে করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকানি ভাষায় 'সাক্' অর্থ চাকমা। আর 'প্রে' অর্থ হলো দেশ, অতএব সাকপ্রে অর্থ হলো চাকমাদেশ বা চাকমারাজ্য।

Joa de Barros নামক এক পর্তুগিজ ঐতিহাসিক ১৫৫০ সালের দিকে একটি মানচিত্র আঁকেন। তাঁর মানচিত্রের নাম Descripcao do Reino de

Bengalla। ঐ মানচিত্র ২৩°৩০´ অক্ষাংশের কাছে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে Chacomas (চাকোমাস) নামে একটি স্থানের নাম রয়েছে। মনে হয় যে, চাকমারা ঐ স্থানের কাছে-পিছে তৎকালে বসবাস করতো। আরাকান-রাজ মেং রাজাগ্যি ওরফে সলিম শাহ্ (১৫৯৩-১৬১২) উক্ত স্থানটি দখল করে তাঁর রাজত্বভুক্ত করেছিলেন। তিনি ঐ সময় বাংলা এবং দক্ষিণ বার্মার পেগুরাজ্যও জয় করেছিলেন। ১৬০৭ সালে আরাকানরাজ চট্টগ্রামস্থ Philip de Brito Nicote নামক জনৈক পর্তুগিজ নাবিককে একটি চিঠিতে নিজেকে the highest and the most powerful king of Arakan, of Tippera, of Chacomas and of Bengal হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও ১৫৯৪ সালে চাকমারা আরাকান রাজার ভাইকে চট্টগ্রাম থেকে স্থলপথে আরাকানে যেতে দেয়নি। তারা তাঁকে বাধা দেয়ায় তিনি (চট্টগ্রামের তৎকালীন গভর্ণর) নৌপথে আরাকান যেতে বাধ্য হন। ১৫৯৯ সালে আরাকান দক্ষিণ বার্মার শক্তিশালী পেগুরাজ্য আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠায়। আরাকানের ১২ জন সেনাপতির মধ্যে একজন ছিলেন চাকমা সেনাপতি। ১৬০০ সালের ২৮ মার্চ পেগুনগরী যখন বিজিত হয় তখন ঐ চাকমা সেনাপতিটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি আরাকান কর্তৃক পেগু পতনের পর পেগু লুঠের জন্য থাইল্যান্ডবাসীরা চেষ্টা করলে তাদেরকে যুদ্ধে হটিয়ে দেন। G. E. Harvey বার্মা রিসার্চ সোসাইটির ৪৪ নং জার্নালে ১৯৬১ সালে একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে চাকমাদের উপর আরাকানের প্রভাব বলবৎ ছিল। এ সময়কার আরাকানি রাজাদের মধ্যে থিরিখুধম্মা (শ্রী সুধর্ম ১৬২২-৩৮ খ্রি:) এর নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর রাজদরবারে বাংলার তৎকালীন মহাকবি আলাওলের পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুরের পিতা শ্রী বড় ঠাকুরকে স্থান দিয়েছিলেন। ১৭৮৭ সালের ২৪ এপ্রিলে আরাকানস্থ বর্মি প্রশাসক তরবুমা চট্টগ্রামস্থ ইংরেজ প্রধানকে একটি চিঠি পাঠান। উক্ত চিঠিতে তিনি থিরিখু ধম্মা-কে 'সিরিখুমা' হিসেবে লেখেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাম্প্রতিককালে সিরাজুল ইসলাম সাহেব Bangladesh District Records, Chittagong (Vol-1,১৯৭৮ ইং)-এর ১০৬—১০৭

পৃষ্ঠায় উল্লিখিত চিঠিটির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি রাজা সিরিথুমা-কে চাকমা হিসেবে (Serytumah Chuckmah)উপস্থাপন করেছেন। মূলত সিরিথুমা (থিরিথুধম্মা) চাকমা রাজা না হলেও চাকমা রাজ্যের অধিপতি অবশ্যই ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চাকমা রাজা চানুই আরাকানরাজকে ছাঁজাইয়ু নামক তাঁর এক কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা থিরিথুধম্মা চাকমা রাজকন্যা ছাঁজাইয়ুর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন কিনা তা ভবিষ্যতে গবেষণার বিষয়। উল্লেখ্য যে, ছাঁজাইয়ুকে তাঁর পূর্বনাম পরিবর্তন করে ছাঁজাইয়ু নামটি প্রদান করা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চাকমা রাজাদের রাজধানী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলার আলেখ্যংডং (বর্তমান আলী কদম) অঞ্চলে। মোগলদের দলিল-পত্রাদি থেকে জানা যায় যে, ১৭১১ সালে চাকমাদের রাজার নাম ছিল চন্দন খান। তাঁকে আরাকানরাজ চান্দাউজিয়া (মহাদণ্ডবো), 'তৈন খান' উপাধি দিয়েছিলেন। চন্দন খানের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে জল্লীল খান মতান্তরে জালাল খান নামক একজন চাকমা রাজা ১৭১৫ সালে চট্টগ্রামস্থ মোগল কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি পাঠান। উক্ত চিঠিতে তিনি তাঁর রাজ্যে চট্টগ্রামস্থ ব্যাপারীদেরকে বাণিজ্য উপলক্ষে অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান এবং বিনিময়ে বাণিজ্য শুল্ক হিসেবে মোগলদেরকে কিছু তুলা দেয়ার অঙ্গীকার করেন। মোগলরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি ১৭১৫ সালে তাঁদেরকে শুল্ক হিসেবে ১১ মণ তুলা দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মোগলেরা তাঁর কাছে খাজনা চেয়ে বসলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এতে মোগলেরা তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ান কিষাণ চাঁদের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠান। চাকমারাজার ভাই ফতে খাঁ এবং তদীয় সেনাপতি কালু খাঁ মোগলদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং জনশ্রুতি মতে মোগল সৈন্যদের কাছ থেকে দু'টি কামান ছিনিয়ে নেন। এর একটি 'ফতে খাঁ' কামান ; ঐটি এখনও রাঙ্গামাটিস্থ চাকমা রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে সাজানো রয়েছে। ফতে খাঁর নামানুসারে কক্সবাজার জেলার রামু থানায় চাকমাকূলের পার্শ্বে 'ফতে খাঁ কূল' নামক স্থানটি এখনও রয়েছে। মোগলদের সাথে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত চাকমারাজা হেরে যান এবং আরাকানে পালিয়ে যান। তিনি সেখানে ১৭২৪ সালে পরলোকগমন করেন।

তার মৃত্যুর পরে ফতে খাঁ ১৭২৬ সালে চাকমাদের রাজা হন। বর্তমান চাকমা রাজবাড়িতে তাঁর একটি সীলমোহর রয়েছে।

১৭৩১ থেকে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে সাংঘাতিক ধরনের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং অরাজকতা দেখা দেয়। এর ফলে আরাকানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোও বিপদগ্রস্ত হয়। ফলে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খান (১৭৩৭-৫৮ খ্রি:) ১৭৩৭ সালে আরাকানের দিক থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসেন এবং মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি তাঁর রাজ্যে মোগলদের অনুকরণে দেওয়ান পদের সৃষ্টি করেন। তাঁর রাজ্যের সীমা উত্তরে ফেনী নদী থেকে দক্ষিণে শঙ্খনদীর মধ্যবর্তী স্থান এবং পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (ঢাকা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড) থেকে পূর্বে কূকীরাজ্য (মিজোরাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজীবন তাঁর সাথে মোগলদের সম্পর্ক ভালো ছিল। তিনি ১৭৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব হেরে যান। ১৭৬১ সালে ইংরেজরা নবাব মীরকাসিমের কাছে চট্টগ্রামের শাসনভার পান। শাসনভার পেয়েই তাঁরা এ অঞ্চলের উপর জোর জুলুম শুরু করেন। তাঁরা রাজার কাছে অধিক খাজনা চাইতে থাকলে ১৭৭৭ সালে চাকমা-ইংরেজ সংঘর্ষের শুরু হয়। রাজা শেরদৌলতের সেনাপতি বীর রণু খান ইংরেজ সেনা-অফিসার মেজর এলারকারের সৈন্যদের সাথে বহু বৎসর যুদ্ধ করেন। ১৭৮২ সালে রাজা শেরদৌলত পরলোকগমন করলে তদীয় পুত্র জানবক্স খান (১৭৮২-৮৭ খ্রি:) চাকমাদের রাজা হন। এ সময় ১৭৮৪ সালে চাকমা-ইংরেজ সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। রাজার সৈন্যরা ফেনী থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। চাকমা সেনাপতিদের মধ্যে মুনগাজী নামে একজন মুসলিম সেনাপতি ছিলেন। অনেকে তাঁকে ত্রিপুরা-বিজয়ী সমশের গাজীর সেনাপতি মুনগাজী বলেও মনে করেন। এখনও চট্টগ্রাম জেলায় ছাগলনাইয়ার অনতিদূরে তাঁর নামানুসারে 'মুনগাজীর হাট' নামে একটি হাট রয়েছে।

১৭৮৫ সালে ইংরেজরা চাকমা রাজার সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের মধ্যে বিরোধের একটি সমঝোতা হয়। ইংরেজরা রাজার ব্যাপারে উদার নীতি

গ্রহণ করেন। এতে চাকমা রাজা ১৭৮৭ সালে তাদের অধীনতা স্বীকার করেন। এর ফলে এই অঞ্চলে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জানবক্স খানের অস্ত্র ত্যাগের ফলে অচিরেই চাকমা রাজ্যের উপর মিজোরামের দুর্ধর্ষ লোকদের আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী এক শতাব্দী ধরে চাকমাদের উপর ঐসব লোকেরা হানা দিয়েছিল।

চাকমারা শক্তিহীন হয়ে পড়ায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই মিজোরাম এবং উত্তর আরাকানের দুর্ধর্ষ উপজাতীয় লোকেরা চাকমাদের এলাকায় হানা দিতে থাকে। এদের দমনের জন্য ইংরেজরা এই অঞ্চলে পুনরায় সেনা নিয়ে আসে। ঐ সময় চাকমাদের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন একজন রানী। তিনি চাকমাদের ইতিহাসে কালিন্দী রানী (১৮৪৪–৭৩ খ্রি:) নামে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইংরেজরা ১৮৬০ সালে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চিটাগাং হিলট্রেক্টস নামে এই নতুন অঞ্চলটির সৃষ্টি করেন। জেলা সদর প্রথমে চন্দ্রঘোনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে ১৮৬৮–৬৯ সালে জেলা সদর চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ সময় চাকমাদের রাজধানীও রাজানগর থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৯০ সালে রাঙ্গামাটিতে বর্তমান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ব্রিটিশ আমলে (১৮৬০–১৯৪৭ খ্রি:) এই অঞ্চলে কোনো প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো হয় নি। ফলে সর্বক্ষেত্রে এই অঞ্চলের লোকেরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের থেকে পিছিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান জন্মলাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই অঞ্চলের উপজাতীয় জনসাধারণের উপর পাকিস্তান সরকার প্রথমে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই পাকিস্তান আমলের (১৯৪৭–৭০খ্রি:) প্রথমার্ধেও এই অঞ্চলের অবস্থা একপ্রকার করুণই বলা যায়। এমতাবস্থায়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে কাপ্তাইয়ে পাকিস্তান সরকার বিরাট একটা বাঁধ নির্মাণ করেন। এতে ২৫০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়। হাজার হাজার চাকমা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। তারা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও নেফায় (বর্তমান অরুণাচলে) পাড়ি জমায়। এ সময় চাকমা–

সমাজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। পাকিস্তান সরকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকায় যারা এখানে রয়ে যায় তাদের অবস্থা আরো করুণ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এই অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি ঘটানোর জন্য বহুসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং উপজাতিদেরকে চাকুরি ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দিতে থাকেন। যেখানে ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৭ সালে মাত্র ১৭৯টি স্কুল ছিল সেখানে পাকিস্তান আমলে স্কুলের সংখ্যা এই অঞ্চলে সাত শতাধিক ছাড়িয়ে যায়। চাকমারা এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায়। তাদের শিক্ষার হারও বেড়ে যায়। পাকিস্তান সরকার এই অঞ্চলে ইরি (IRRI) ধান চাষের প্রবর্তন করেন। এখানে তখন প্রতি একরে ৭০ থেকে ৯০ মণ পর্যন্ত ইরিধান উৎপন্ন হতো। এতে চাকমাদের খাদ্যাভাব কিছুটা দূর হলেও পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে এই অঞ্চলে চাকমা-সমাজে কিছুটা স্থিরতা ফিরে আসে। ঐ সময় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে চাকমারা মডার্ন মেডিসিন বা ডাক্তারি ঔষধপত্র ও চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় বিগত দুই দশকে তাদের জনসংখ্যার হারও বৃদ্ধি পায়।

১৯৭০ সালে পাকিস্তান আমলে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে রাজা ত্রিদিব রায় জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও অংশৈ প্রু চৌধুরী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের নাগপাশ ছিন্ন করে বাংলাদেশ নতুন একটি দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। বাংলাদেশ সরকার সুদীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত এই অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে একটি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানকাব উপজাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে একটি 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে উপজাতীয় ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এতে এই অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম থেকেও চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা ভাষায় খবর পরিবেশনসহ পাহাড়িকা নামে একটি উপজাতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত চাকমা রাজাগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	রাজার নাম	সময়	পূর্ববর্তী রাজার সাথে সম্পর্ক
১.	রাজা সাখুয়া	...	...
২.	রাজা চন্দন খান	(১৭১১খ্রি:)	রাজা সাখুয়ার বড় ছেলে।
৩.	রাজা রত্তন খান	(১৭১২খ্রি:)	রাজা সাখুয়ার ছোট ছেলে।
৪.	রাজা কুতয়া	(১৭১৩খ্রি:)	?
৫.	রাজা জল্লীল খান	(১৭১৫–১৭২৪খ্রি:)	রাজা সাখুয়ার দৌহিত্র।
৬.	রাজা ফতে খান	(১৭২৬খ্রি:)	জল্লীল খানের ছোট ভাই।
৭.	রাজা সেরমুস্ত খান	(১৭৩৭–৫৮খ্রি:)	রাজা ফতে খানের ছেলে।
৮.	রাজা শের জব্বর খান	(১৭৫৮–৬৫খ্রি:)	রাজা সেরমুস্ত খানের ভাই।
৯.	রাজা শেরদৌলত খান	(১৭৬৫–৮২খ্রি:)	রাজা শেরজব্বর খানের ছেলে।
১০.	রাজা জানবক্স খান	(১৭৮২–৮৭খ্রি:)	শেরদৌলত খানের ছেলে।
১১.	রাজা টব্বর খান	(১৭৯৮–১৮০১খ্রি:)	জানবক্স খানের বড় ছেলে।
১২.	রাজা জব্বর খান	(১৮০১–১২খ্রি:)	জানবক্স খানের ছোট ছেলে।
১৩.	রাজা ধরমবক্স খান	(১৮১২–৩২খ্রি:)	রাজা জব্বর খানের ছেলে।
১৪.	রানী কালিন্দী	(১৮৪৪–৭৩খ্রি:)	রাজা ধরমবক্স খানের প্রথমা স্ত্রী।
১৫.	রাজা হরিশচন্দ্র রায়	(১৮৭৩–৮৫খ্রি:)	রাজা ধরমবক্স খানের দৌহিত্র।
১৬.	রাজা ভুবনমোহন রায়	(১৮৯৭–১৯৩৩খ্রি:)	রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের ছেলে।
১৭.	রাজা নলিনাক্ষ রায়	(১৯৩৫–৫১খ্রি:)	রাজা ভুবনমোহন রায়ের ছেলে।
১৮.	রাজা ত্রিদিব রায়	(১৯৫৩–৭১খ্রি:)	রাজা নলিনাক্ষ রায়ের ছেলে।
১৯.	রাজা দেবাশীষ রায়	(১৯৭৭—খ্রি:) বর্তমান রাজা	রাজা ত্রিদিব রায়ের ছেলে।

পূজা পার্বণ উৎসব

গ্রামাঞ্চলে চাকমাদের মধ্যে অনেক ধরনের পূজা পার্বণ প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে ভাত-দ্যা, থান-মানা, ধর্মকাম এবং হাল-পালনী উল্লেখযোগ্য।

ভাতদ্যা: পূর্ব পুরুষের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে তাঁরা মৃত্যুর পরে কে কোথায় জন্ম নিলেন নির্ণয় করার জন্য "ভাতদ্যা" পূজা করা হয়। চাকমাদের বিশ্বাস পূর্ব পুরুষেরা আবার নিজেদের মধ্যে জন্ম নেন।

হালপালনী : চাকমারা বাংলা বর্ষের আষাঢ় মাসের সাত তারিখ ফসলের দেবী মা-লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে খানা দেয় এবং ঐদিন বলদগুলোকে চাষাবাদ থেকে অব্যাহতি দেয়। উক্ত উদ্‌যাপিত দিনটিকে চাকমা ভাষায় 'হালপালনী' বলা হয়।

থানমানা : গ্রামের লোকেরা গ্রামবাসীদের মঙ্গলের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার সবাই মিলে ১৪ জন দেবদেবীকে একত্রে একটি পূজা দেয়, এর নাম থানমানা পূজা। এটি নদী-তীরে করা হয়। এতে ফসলের দেবী মা-লক্ষ্মীমা, নদীর দেবী মা-গঙ্গী, বাঘের দেবতা মাত্যা, ভূতের রাজা 'ভুদরাজা' প্রভৃতি দেবদেবীকে পূজা দেওয়া হয়।

ধর্মকাম : গৃহস্থের মঙ্গল এবং উন্নতির জন্য জঙ্গলে ধর্মকাম পূজা করা হয়। এতে লুরিরা পৌরোহিত্য করেন। উক্ত পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে দেয়া "ভাতের মোচায়" (কলাপাতায় মোড়ানো ভাত তরকারিতে) মাকড়সার অবশ্যই আগমন ঘটে বলে চাকমাদের প্রচলিত বিশ্বাস।

বিঝু উৎসব : চাকমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন 'বিঝু'। বাংলা বর্ষের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা বিঝু উৎসব পালন করে। পুরানো বর্ষের শেষ দিন মূল-বিঝু, তার আগের দিন ফুল-বিঝু এবং নববর্ষের প্রথম দিনটিকে 'গোর্জ্যাপর্জ্যা' দিন বলা হয়। উপরোক্ত তিনটি দিনের মধ্যে মূল-বিঝু দিনটিই প্রকৃত বিঝু দিন। ঐদিন ঘরে ঘরে প্রচুর খানাপিনার ব্যবস্থা

করা হয় এবং অতিথিদের জন্য সবার দ্বার উন্মুক্ত থাকে। শিশুরা ঘরে ঘরে আদর পায় এবং বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। কিশোরীরা খুব ভোরে নদী থেকে জল তুলে নানা-নানীদেরকে স্নান করিয়ে ঐদিন পুণ্য অর্জন করে। নববর্ষ বা গোর্জ্যাপোজ্যা দিনে অনেকে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের পূজা করে ও বৌদ্ধভিক্ষুদের কাছে ধর্মের দেশনা শ্রবণ করে।

ধর্ম : চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রায় গ্রামে ক্যাং (বৌদ্ধ-মন্দির) রয়েছে। সেখানে ভন্তেরা (বৌদ্ধ ভিক্ষুরা) থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনগুলোতে জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেন। ভন্তেদের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত প্রত্যেক পরিবার একবার করে স্যং (ভিক্ষুদের আহার) ক্যাং-এ দান করে। আর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনগুলোকে ভক্তি-সহকারে পালন করে। এর মধ্যে ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব লাভের দিনটির স্মরণে সাড়ম্বরে "বৈশাখী পূর্ণিমা" পালন করা হয়। তা'ছাড়া মাঘী পূর্ণিমার দিনে ক্যাং-এর প্রাঙ্গণে ব্যূহচক্র রচনা করা হয় ও রাত্রে আকাশে গৌতম বুদ্ধের চুলগুলোর সম্মানে ফানুস উড়ানো হয়।

উপরোক্ত ব্যূহচক্র, তৃষ্ণার কারণে মর্ত্যলোকের বিভিন্ন জীবদের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও সংসারের বিভিন্ন গোলক ধাঁধায় সংসরণের ইঙ্গিত বহ।

গৃহ ও বাসস্থান

চাকমারা গৃহকে 'ঘর' এবং গ্রামকে 'আদাম' বলে। সচরাচর ছোট ছোট নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় চাকমাদের গ্রামগুলো হয়ে থাকে।

শক্ত গাছের খুঁটির উপর চাকমারা যে ঘর বাঁধে তার নাম "মজাঘর" (মাচাঘর)। মাচাঘরের সামনে জলের পাত্র রাখার জন্য একটি খোলা মাচা থাকে, তার নাম 'ইজর'। ইজরে উঠার জন্য একটি গাছের সিঁড়ি থাকে, এর নাম 'সাঙু'। ইজরের পরে মূল ঘরে প্রবেশের পর প্রথম যে অংশটি ঘরের চালের নিচে পাওয়া যায় তার নাম 'চানা'। কামরাকে চাকমা ভাষায় 'গুধি' বলা হয়। ঘরের পিছনের কামরাটিকে 'ওজেলেং' বলা হয়।

পোশাক পরিচ্ছদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল উপজাতির নিজস্ব পোশাক পরিচ্ছদ রয়েছে এবং তারা নিজেরা নিজেদের তাঁত দিয়ে পোশাক তৈরি করে।

চাকমা মেয়েদের নিম্নাংগে পরনের কাপড়ের নাম 'পিনোন' এবং বক্ষবন্ধনীর নাম 'খাদি'। পুরুষেরা 'কবোই' (এক জাতীয় মোটা সুতার জামা) এবং ধুতি ও গামছা পরে এবং মাথায় 'খবং' (এক জাতীয় পাগড়ি) বাঁধে।

কুটির শিল্প

চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, ফাঁদ, পাখা, চিরুণী, বাঁশি এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। চাকমাদের বিভিন্ন ঝুড়ির মধ্যে 'ফুলবারেং' দেখতে খুবই সুন্দর ঝুড়ি। আর ফাঁদের মধ্যে 'কাবুক'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কাবুক দিয়ে বাঘ মারা হয়।

বয়ন করাকে চাকমা ভাষায় 'বেন-বুনা-না' ; বলা হয়। আর তাই কোমর তাঁতের নাম চাকমা ভাষায় 'বেন'। জুমে তুলা উৎপন্ন হয়। ঐ তুলা থেকে চর্‌কা কেটে সুতা তৈরি করে ঐ সুতা বিভিন্ন রং-এ রাঙানোর পর তা দিয়ে বেন বুনে কাপড় তৈরি করা হয়।

মেয়েদেরকে বিভিন্ন ডিজাইন শিক্ষা দেওয়ার জন্য চাকমাদের বিশেষ ধরনের ডিজাইন ক্লথ (নক্‌শা যুক্ত কাপড়) রয়েছে। এর নাম 'আলাম'। আলামে বিভিন্ন ধরনের ফুল, বৃক্ষ এবং জীবজন্তুর চোখ, পদচিহ্নের আকৃতি প্রভৃতির নকশা রয়েছে।

চাকমা মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে 'ফুলখাদি' ও নানা ধরনের ওড়না দেশী ও বিদেশী সকল লোকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

খাদ্যাভ্যাস

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সাথে প্রচুর পরিমাণে মাছ, মাংস এবং শাকসবজি খেতে ভালোবাসে। খাদ্যের মধ্যে মুরগী, শূকর, কাকড়া, ব্যাঙ, হরিণের মাংস এবং বাঁশ-কোড়লের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঁশকোড়ল দিয়ে চাকমা মেয়েরা বেশ কয়েক ধরনের রান্না ও ভাজি করে। এটি চাকমাদের একটি খুবই প্রিয় খাদ্য। চাকমারা শাক ও মরিচ বেশি খায় এবং শুটকির তরকারি খেতে ভালোবাসে। গ্রামাঞ্চলে চাকমাদের রান্নায় তৈল এবং শুকনো মশল্লার ব্যবহার কম হয়। জুমে উৎপন্নজাত ফুঝি, সাবারাং বাগোর প্রভৃতি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ চাকমারা কাচা মশলা হিসেবে তরকারিতে ব্যবহার করে। ঐগুলো ব্যবহার করলে তরকারি সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু হয়। চাকমাদের রান্নাবান্না খুবই ছিমছাম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

খেলাধুলা

চাকমারা খেলাধুলার মধ্যে হাডুডু, কুস্তি এবং 'ঘিলা-খারা' খেলতে ভালোবাসে। হাডুডুর নাম চাকমা ভাষায় 'গুডু-খারা' এবং কুস্তিকে চাকমা ভাষায় 'বলিখারা' বলা হয়। গ্রামাঞ্চলে ঘিলা নামক এক জাতীয় বিচি দিয়ে 'ঘিলা-খারা' খেলা হয়। এইটি চাকমাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। মেয়েরা বউচি খেলতে ভালোবাসে। বউচি খেলার নাম চাকমা ভাষায় 'পোত্তিখারা'।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান

জন্ম : কোনো পরিবারের শিশু জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তাকে মধু পান করানো হয়। এর উদ্দেশ্য যাতে আগামীতে তার জীবন সর্বক্ষেত্রে মধুময় হয়ে ওঠে। এরপর সপ্তাহ অন্তে ওঝা ডেকে 'ঘিলা-কজই-পানি' দিয়ে তার চুলগুলো ধুয়ে তাকে পবিত্র করা হয়। (আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে ঘিলা একজাতীয় ফলের বিচি এবং কাজই' হলো হলুদ জাতীয় এক প্রকার দ্রব্য)। মাস কয়েক পরে শিশু একটু বড় হলে তার চুলগুলো নাপিত ডেকে মুড়িয়ে দেয়া হয়। এটি চাকমাদের একটি অবশ্যই করণীয় রীতি। তা না হলে প্রসূতির অন্য লোকের বাড়িতে ওঠার বেলায় নিষেধ রয়েছে।

মৃত্যু : কোনো লোকের মৃত্যু হলে তার মরদেহ শুভ্র কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। ঐ সময় ঢোল বাজিয়ে বিশেষ জাতীয় তাল বাজানো হয়। ঐ তাল (ঢোলের শব্দ) শুনে পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারে কোন বাড়িতে লোক

মারা গেছে। তখন গৃহস্থেরা ঐ বাড়িতে খবর ধরতে যায় এবং গৃহিণীরা গৃহের সদর দরজায় মাটির বারকোষে তুষ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এটি সম্ভবত কোনো অপদেবতা বা ভূত-প্রেত যাতে ঐ গৃহে উপদ্রব করতে না পারে তার জন্য করা হয়।

শবদাহের দিন মৃত লোকটির দেহটি স্নান করানো হয়। ঐ সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু ডেকে মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা মঙ্গলসূত্র পাঠের ব্যবস্থা করে। অথবা লুরি নামে এক জাতীয় বিশেষ ধরনের বৌদ্ধ পুরোহিত ডেকে 'জয় মঙ্গল তারা' বা 'আঘর তারা' নামক গ্রন্থাদি থেকে বিভিন্ন 'তারা' পাঠ করে শুনায়। মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা তার আত্মার সদগতি কামনা করে তার বুকে টাকা পয়সা প্রভৃতি দান করে। এগুলো তার পরলোকে লাগবে বলে বিশ্বাস করা হয়। শবটিকে বাঁশ নির্মিত একটি বিশেষ বাহনে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐটির নাম 'আলং'। মৃতদেহটি বাড়ি থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নামানোর সাথে সাথে ঐ বাড়ির (মৃতের বাড়ির) যাবতীয় পানি ও উনুনের ছাই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। এটা মৃতের সাথে ঐ বাড়ির সম্পর্ক ছিন্নের প্রতীক।

মৃত দেহটির সাথে একটি পুটলিতে তার জন্য ভাত ও অন্যান্য খাদ্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐগুলো মৃতদেহটি দাহ করার আগে তার মুখে শেষবারের মতো স্পর্শ করানো হয়।

গ্রামের লোকেরা প্রত্যেকে চিতা সাজানোর জন্য জঙ্গল থেকে শ্মশানে কাঠ নিয়ে যায়। মৃত লোকটি পুরুষ হলে চিতায় পাঁচ স্তর লাকড়ি এবং স্ত্রীলোক হলে সাত স্তর লাকড়ি সাজানো হয়।

এরপর মৃতদেহটি আলং-সহ চিতার চারদিকে পুরুষ হলে পাঁচবার এবং স্ত্রীলোক হলে সাতবার ঘুরানো হয় এবং প্রতিটি ঘুরানো বা প্রদক্ষিণের পর একবার করে চিতার সাথে সামান্য ধাক্কা দিয়ে চিতায় তুলে দেয়া হয়।

মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র বা রক্ত সম্পর্কের নিকটস্থ কোনো আত্মীয় প্রথম তার চিতায় অগ্নিসংযোগ করে। পরে অন্যান্যরা চিতায় আগুন দেয়।

পরদিন তার স্বগোত্রের কোনো একজন আত্মীয় শ্মশানে গিয়ে তার হাড়গুলো থেকে কিছু হাড়সহ সামান্য ভস্মাবিশিষ্ট ছাই একটি নতুন পাতিলে

সংগ্রহ করে পাতিলটির মুখ সাদা কাপড়ে ঢেকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। একে 'হাড়-ভাসানো' বলে।

পরে ঐ চিতার চার কোণে চারটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের মাথাগুলোতে সাদা কাপড়ের চন্দ্রাতপ উড়িয়ে দেওয়া হয়। ঐটি চিতায় ছায়া দান করে। কেউ কেউ বাঁশের মাথায় লম্বা ধরনের সাদা কাপড় (টাংগোন) উড়িয়ে দেয়।

মৃতলোকটি কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে তাকে অন্যান্য লোকের নিরাপত্তার কারণে কবর দেয়া হয়। এছাড়া ছোট শিশুদেরকেও কবরস্থ করা হয়। তবে বয়স্ক লোক এবং যে সব শিশুদের দাঁত উঠেছে তাদের হাড়গুলো পরে কবর থেকে তুলে পুনরায় চিতায় পোড়ানো হয়।

বিবাহ : চাকমাদের বিবাহের রীতিনীতি বেশ চমৎকার। প্রাচীনকালে যে সমস্ত রীতিনীতিগুলো চাকমা-সমাজে প্রচলিত ছিল, কালের বিবর্তনে সেগুলোর অনেকই আজ অচল এবং অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তবুও যে কয়টি এখনও আছে সেগুলো মৌলিক রীতিনীতিগুলোরই স্বাক্ষর বহন করছে। এগুলো আজও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্দরে-কন্দরে সাদরে পালিত হয়। এবার বিবাহের রীতিনীতিগুলোর কথা বলা যাক। পাত্রী পছন্দের ব্যাপারে পুরানো সমাজে অভিভাবকের মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। বিবাহের পূর্বে 'সাবালা' (ঘটক) বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। চাকমা বিবাহের নিয়মানুসারে পাত্রের বাবাকে কিংবা কোনো আত্মীয়কে পাত্রীর বাবার কাছে বিবাহের পূর্বে তিনবার অন্তত যেতে হবে। বলাবাহুল্য প্রতিবারে পাত্রের বাবার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সুখাদ্য এবং বস্ত্রাদি উপহারস্বরূপ থাকে। চাকমা-বিবাহে মদের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। বিবাহের চূড়ান্ত দিন ধার্য করার জন্য পাত্রের বাবা পাত্রীর বাবার কাছে মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে যায়। এটা একটা অবশ্য করণীয় বিষয়। এটাকে চাকমারা 'মদপিলাং' বলে। উক্ত তিনবার ওঠাবসার মধ্যে বিবাহের দিন ধার্য বাদেও কনের জন্য গয়না-গাটি এবং পণের টাকা ঠিকঠাক হয়। পূর্বে পাত্রীর বাবা পাত্রের বাবার কাছ থেকে পণের টাকা হিসেবে সামান্য টাকা টোকেন-স্বরূপ

নিতেন। গয়না হিসেবে কনেকে কানে ঝুঙুলি, গলায় পিচ্ছিছরা, হাতে বাঙোরি, খুজিখারু, পায়ে ঠেংখাড়ু ও নানাবিধ অলঙ্কার-পত্র দিতে হতো। বর্তমানকালের কনেরা অবশ্য আধুনিকা। তাই আধুনিক অলঙ্কার ব্যবহার করতে তারা ভালোবাসে। বিবাহের দিনে বরযাত্রীরা শুভক্ষণ দেখে কনের বাড়িতে রওনা হয়। তারা ফুলবারেঙে (বেত-নির্মিত এক জাতীয় ঝুড়িতে) কাপড়-চোপড় অলংকারাদি ও প্রসাধনী সামগ্রীগুলো সাজিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে এক্ষেত্রে স্যুটকেস ব্যবহৃত হচ্ছে। শুভ যাত্রার প্রাক্কালে বাজী ফুটানো হয়। বরযাত্রীরা কনের বাড়িতে পৌঁছলে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। সেখানে কনেকে বরপক্ষের লোকেরা মনের মতো সাজিয়ে থাকে। বউ নিয়ে যাবার আগে কনের অভিভাবকেরা কনেকে আশীর্বাদ করে। একটা থালায় চাল ও বীজযুক্ত তুলা থাকে। আশীর্বাদক ঐ থালা থেকে এক টুকরা তুলায় সামান্য চাল নিয়ে থুতু শব্দ করে, তারপর তা বর ও কনের মাথায় ছিটায়। এভাবে আশীর্বাদ-পর্ব সমাপ্ত হলে বরযাত্রীরা বউ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ হলো কনের বাড়ির খবর। এবার বরের বাড়ির অবস্থা দেখা যাক। বস্তুত বরের বাড়িতে বিবাহের সত্যিকার বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। সেখানে যে সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা গেল :

১. আগপানিকুম তুলানা এবং পানপাদা ভাঝেই দেনা
২. বউ তুলানা
৩. জোড়া-বানি-দেনা এবং
৪. চুঙুলাং (পূজা) ইত্যাদি।

আগপানিকুম তুলানা

উষার সাথে সাথে সচরাচর ছয়জন যুবতীসহ একজন সধবা মহিলা নদীতে জল আনতে যায়। তাদের মধ্যে একজন দুই হাতে দুই টুকরো কলাপাতায় ফুল সাজিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। আর একজন দু'টি সরর (মাটির তৈরি ঢাকনার) উপর দু'টি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নদীতে নিয়ে যায়। স্নানের সময় সধবা মহিলাটি দুই টুকরো কলাপাতায় পানসুপারী রেখে নদীতে ভাসিয়ে

দেয়। ঐ দুই টুকরো কলাপাতা যদি একত্রে ভাসতে থাকে, তবে বিবাহটি শুভ হিসেবে ধরা হয়। এ প্রথা অবশ্য বর্তমানে অচল। পবিত্র জলের কলসী নিয়ে যুবতীরা বিয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। দুজন যুবতী সদর দরজার দুই পাশে দুটি কলসী রেখে দেয়। সধবা মহিলাটি মাটির প্রদীপ দু'টি কলসী দু'টির উপর জ্বালিয়ে রেখে দেয়। কলসী দু'টিকে গলায় সাতবার সুতার বন্ধনী দিয়ে যুক্ত করা হয়। এটাকে 'সাতনালী সুতা' বলে। কনেকে বাড়িতে তোলার পর ঐ সুতা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এটাকে কনের সাথে তার বংশের সম্পর্ক ছিন্নের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

বউতুলানা

বরযাত্রীরা কনেকে নিয়ে আগমন করলে বরের বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে যায়। আগের দিনে বিপুল আনন্দের সাথে বাজী ফুটানো হতো। বরের ভাবি বা ছোট বোন একজন এসে কনেকে জড়িয়ে ধরে বাড়িতে তোলে। কনেকে বাড়িতে তোলার সময় একটা সুতার প্রান্ত ধরে বরের মা আগে আগে হাঁটেন। সুতার অপর প্রান্ত কনের বাম হাতের কনিষ্ঠাংগুলিতে বাঁধা থাকে। এভাবে কনেকে বরের বাড়িতে বউ হিসেবে তোলা হয়। এরপরে কনেকে তার জন্য রাখা নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ কামরাকে 'ফুল-ঘর' বলে।

জোড়াবানানা

বিবাহের শুভলগ্ন আগত হলে বর ও কনেকে বিবাহের আসরে পাশাপাশি বসানো হয়। কনে বরের বাম পাশে বসে। এরপরে বরের ভগ্নিপতি বা ভাবি, বর ও কনেকে জোড়া বেঁধে দেন। তাদেরকে সাবালা (বা ছায়েল-ছায়েলী) বলে। সাবালা উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করে,"জোড়া বেঁধে দেবার হুকুম আছে কি"? তখন সবাই "আছে আছে" বলে। এই জিজ্ঞাসার পিছনে যে সামাজিক কারণটি নিহিত আছে, তা হলো এই যে, চাকমা-সমাজে কনেকে বরের দূর সম্পর্কের বোন বা ঐ শ্রেণীর কেউ হতে হবে। তা না হলে, যেমন কনে যদি বরের পিসী, মাসী অথবা ভাগ্নী শ্রেণীর হয়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। চাকমাদের মধ্যে চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

চুঙুলাং

এরপর বিবাহ-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যকারী ওঝা দেবতাদের উদ্দেশ্যে চুঙুলাং পূজা করে। ঐ পূজায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে সচরাচর তিনটি কুহ্‌রা (মোরগ-মুরগী) বলি দেয়া হয়। কেউ কেউ শুকর কেটেও চুঙুলাং করেন। চুঙুলাং পূজায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে কনেকে নিজে গিয়ে কূয়া থেকে জল এনে দিতে হয়। পূজার শেষে ওঝার নির্দেশে নব দম্পতি ঐ পূজায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাদের প্রণাম জানায়।

এরপর তারা উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনদেরকে প্রণাম জানিয়ে তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয়। আশীর্বাদের সময় একটা গোল কুলায় কিছু চাল ও তুলা আনা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিরা ঐখান থেকে কিছু তুলায় চাল নিয়ে তাতে সামান্য থুথু শব্দ করে ঐগুলি তাদের মাথায় তুলে দিয়ে তাদেরকে আশীর্বাদ করে। এই হলো মোটামুটি চাকমাদের বিয়ের রীতিনীতি।

চাকমাদের দল-উপদল, গোত্র, পরিবার ও সামাজিক কাঠামো

দল-উপদল

চাকমারা প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত - চাঙমা (চাকমা), তঞ্চঙ্গ্যা (টংটংগ্যা) এবং দৈংনাক (Doingnak)। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাঙমা এবং তঞ্চঙ্গ্যা উভয় দলের লোকই রয়েছে। চাঙমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুণাচলে যেমন ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি তঞ্চঙ্গ্যারাও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ছাড়িয়ে বার্মার আরকান অঞ্চলের আকিয়াব জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। মূলত আরাকানিরা সেখানে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকেই দৈংনাক (Doingnak) বলে। তারা এখনও সেখানে চাকমা ভাষায় কথা বলে। ১৮৪১ সালে আরাকানের তদানীন্তন ইংরেজ কমিশনার Col. Phayre সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটির (Vol. X) , ১১৭ নং জার্নালে দৈংনাকদের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, তারা নিজেদেরকে Kheim-bo-nago (খেইম-বো-নগো) বলে। এতে মনে হয় যে, তারা সম্ভবত তাঁকে তাদের আদি বাসস্থান চম্পকনগর বা চম্পানগোর কথা বলেছিল, যা সাহেবের আরাকানি দোভাষী বিকৃতভাবে 'খেইম-বো-নগো' বলেছে। এটি অবশ্য অনুমান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে সেখানে এখনও 'চাঙমা' (চাকমা) বলে।

আরাকানি ভাষায় 'টং' অর্থ পাহাড়। আর 'য়া' অর্থ জুম আর তাই 'টংয়া' অর্থ জুমিয়া। আরাকানি ভাষায় 'টং' শব্দের আরও একটি অর্থ আছে--এটি হলো দক্ষিণ দিক। এ থেকে অনেকে 'টংটংগ্যা' শব্দের অর্থ দক্ষিণের জুমিয়া মনে করেন। তবে তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি (১৯৮৫ ইং বান্দরবান) গ্রন্থের লেখক মি. যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা মনে করেন, তঞ্চঙ্গ্যা নামটি সম্ভবত

'তৈনতংয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাঁর মতে তৈনতংয়া শব্দের অর্থ তৈন্যাছড়ী নদীর তীরবাসী জুমিয়া। এ বিষয়ে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক মি: অশোক কুমার দেওয়ান মনে করেন, তৈনছড়ী নদীর নামানুসারে চাকমাদের তৈন্যা-গঝা, তঞ্চঙ্গ্যাদের ধৈন্যা গঝা এবং আরাকানের দৈনাক বা দৈংনাকদের নামকরণ হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এখানকার তঞ্চঙ্গ্যাদের ধৈন্যা গঝার লোকদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে আরাকানস্থ দৈংনাকদের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। উল্লেখ্য যে, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং দৈংনাকরা সবাই একই ভাষায় কথা বলে।

তবে উপরে আলোচিত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকরা এখনও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

গঝা এবং গুখি

চাকমা ভাষায় গোত্র বা গোষ্ঠী শব্দের প্রতিশব্দ হলো 'গুখি'। আর কয়েকটি গুখি নিয়ে হয় একটি গঝা (দল)। চাকমাদের অনেকগুলো গঝা এবং শতাধিক গুখি রয়েছে। শ্রী সতীষ চন্দ্র 'চাকমা জাতি' (১৯০৯ ইং) গ্রন্থে ১৩৩টি গোষ্ঠীর হিসেব দিতে সক্ষম হয়েছেন। চাকমা-সমাজে গঝার চেয়ে গুখির গুরুত্ব অধিক। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে গুখির গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এখানে বিভিন্ন গুখিতে বিভিন্ন ধরনের টাবু (নিষেধ) দেখা যায়, যেমন :

১.	লার্মা-গঝা চার্জ্যা গোষ্ঠীর	:	উনুনশালে একত্রে তিনটি চুল্লি তৈরি করা নিষেধ।
২.	লার্মা-গঝা সাতভেইয়া গোষ্ঠীর	:	ভঙরবিজি নামক বিচির মালা গলায় পরা নিষেধ।
৩.	লার্মা-গঝা কবাল্যা গোষ্ঠীর এবং পিড়াডাঙা গোষ্ঠীর	:	মিষ্টি কুমড়োর শাক লাগানো নিষেধ

৪.	বোর্বুয়া-গঝা নাদুকতুয়া গোষ্ঠীর	:	মিষ্টি-কুমড়োর শাক লাগানো নিষেধ।
৫.	বোর্বুয়া-গঝা কালাবা-দাঘির	:	মোরগ এবং শূকর বিক্রি করা নিষেধ।
৬.	বুং-গঝা বাঘওঝা গোষ্ঠীর	:	বন্য পুঁইশাক বাড়িতে আনা নিষেধ।
৭.	তঞ্চঙ্গ্যা মু-অ-গঝা তাচ্ছি গোষ্ঠীর	:	মদ্দা শূকর বাজারে বিক্রি করা নিষেধ ইত্যাদি।

চাকমা ভাষায় taboo শব্দের প্রতিশব্দ হলো 'হুমা'। পূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের টাবুগুলো মেনে চলতো। তখন তাদের বিশ্বাস ছিল গোষ্ঠীর কেউ টাবু ভঙ্গ করলে তার পরিবারের কাউ না কাউকে বাঘে ধরে খায়, অথবা তাদের নানাবিধ অমঙ্গল দেখা দিতে পারে। বর্তমানে এই সংস্কার চাকমাদের মধ্যে বিশেষত শহুরে চাকমাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে। নিম্নে চাকমা সমাজে গোষ্ঠীর গুরুত্ব সম্পর্কে কতগুলো বিষয় তুলে ধরা গেল :

ক. শিশুর জন্মের সময় প্রসূতিকে স্বামীর ঘরে অথবা স্বামীর গুখির (বংশের) নিকটস্থ কোনো আত্মীয়ের ঘরে সন্তান প্রসবের জন্য নেয়াই রীতি। নিজের গুখির বাইরে অন্য লোকের ঘরে শিশু প্রসব করা চাকমাদের রীতি-বিরুদ্ধ। এতে শিশুর বংশ-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং অনেকে শিশুর উপর নানা ধরনের কুপ্রভাব পড়তে পারে বলে বিশ্বাস করে। আর কারোর বাড়িতে তার গোষ্ঠীবহির্ভূত কোনো স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করলে ঐ বাড়িতে নানাবিদ অমঙ্গল হতে পারে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। এ কারণে এ জাতীয় পরিস্থিতিতে ঐ বাড়ির লোকেরা ওঝা ডেকে মন্ত্রপূত পানি তাদের মাথায় ও বাড়িতে ছিটিয়ে পবিত্র হয়। এই ব্যয়ের অর্থ তারা শিশুর পিতার কাছে জরিমানাস্বরূপ দাবি করে।

খ. বিবাহের সময় চাকমাদের অতীতে সাতপুরুষ পর্যন্ত স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এটি পাঁচ পুরুষে নেমে এসেছে। এখনও চাকমারা পারতপক্ষে স্বগোষ্ঠীতে বিয়ে করে না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, চাকমাদের রীতি অনুযায়ী নিজের অথবা স্বগোষ্ঠীর ও জ্ঞাতির বাড়িতে কনে এনে বিয়ে করাই রীতি।

গ. এমন কি মৃত্যুর সময়ও চাকমাদের নিজের অথবা স্বগোষ্ঠীর কারোর বাড়িতে মরাই রীতি। কোনো গোষ্ঠীর লোকের বাড়িতে ভিন্ন গোষ্ঠীর কোনো লোক মরমর হলে তাকে বাড়ির চালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তা না হলে ঐ বাড়িতে 'ফি' (কুফা) লাগতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে চিতায় তার মরদেহ দাহ করার ব্যাপারে প্রথম মুখাগ্নি করার দায়িত্ব হলো তার ছেলের অথবা তার বংশের রক্ত সম্পর্কীয় নিকট কোনো আত্মীয়ের।

ঘ. চাকমাদের জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহে কোনো অবস্থাতেই একজন পুত্র-সন্তানের গোষ্ঠীগত পরিচয় কোনো পরিবর্তন হয় না। এ বিষয়ে চাকমারা ঘোরতরভাবে পিতৃতান্ত্রিক। তবে বিয়ের পরে মেয়েদের গোষ্ঠীর পরিবর্তন হতে পারে। রীতি অনুযায়ী তাদের যে গোষ্ঠীতে বিয়ে হয়, অর্থাৎ তার স্বামী যে গোষ্ঠীর লোক হয় তারাও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

মিঃ বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান বান্দরবানের অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ঝরণার ৩য় সংখ্যায় (১৯৬৭ ইং) 'চাকমা জাতির ইতিকথা' নামক প্রবন্ধ থেকে : চাকমাদের গঝাগুলোর নাম দেয়া গেল :

১. লার্মা-গঝা, ২. ধামেই-গঝা, ৩. চেগে-গঝা, ৪. বাবুর-গঝা, ৫. বুং-গঝা, ৬. বগা-গঝা, ৭. লেবা-গঝা, ৮. ফাক্সা-গঝা, ৯. মুলিমা-গঝা, ১০. খ্যাংগি-গঝা, ১১. চাদঙ-গঝা, ১২. ওয়াংঝা-গঝা, ১৩. বোর্বুয়া-গঝা, ১৪. রাঙী-গঝা, ১৫. আঙু-গঝা, ১৬. পুয়া-গজা, ১৭. তৈন্যা-গঝা, ১৮. কাম্বি-গঝা, ১৯. চেক্কব-গঝা, ২০. পেদাংশ্রী-গঝা, ২১. ঐয়া-গঝা, ২২. কুরাকুত্যা, ২৩. তেইয়া-গঝা, ২৪. পুঙা-গঝা, ২৫. কুদুগ-গঝা, ২৬. লচরে-গঝা, ২৭.

উচ্ছুরী-গঝা, ২৮. দার্জ্যা-গজা, ২৯. মুলিমা-চেগে, ৩০. খ্যাং-চেগে, ৩১. দুখ্যা-চেগে ৩২. বর-চেগে ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যাদের গসা (গঝা) গুলোর নাম :

১. মো-গসা, ২. কার্বুয়া-গসা, ৩. ধৈন্যা-গসা, ৪. মংহ্লা-গসা, ৫. মেলং-গসা, ৬. লাং-গসা, ৭. অঙ্য-গসা, ৮. লাহ্পোস্যা-গসা, ৯. অশ্বী-গসা, ১০. ওয়া-গসা, ১১. মুলিমা গসা, ১২. রাঙী-গসা ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত তঞ্চঙ্গ্যাদের গঝাগুলোর নাম মি. যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক গিরিনির্ঝর ৩য় সংখ্যায় (১৯৮২ ইং) প্রকাশিত প্রবন্ধ 'তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতি' থেকে সংগৃহীত।

পারিবারিক এবং সামাজিক কাঠামো

চাকমারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। পরিবারে পিতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পিতার পরে মাতা, তৎপরে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পুত্রদের মতামত স্থান পেয়ে থাকে। সাধারণত বয়স হলেই মেয়েরা অন্য ঘরে বউ হয়ে চলে যায়, তাই তাদের মতামতের খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। এমন কি পিতা তার জীবদ্দশায় তাদেরকে কোনো সম্পত্তি দিয়ে না গেলে মেয়েরা পিতার মৃত্যুর পরে কোনো সম্পত্তিই পায় না। চাকমা-সমাজের রীতি অনুযায়ী ভাইদের বর্তমানে মেয়েদের কোনো উত্তরাধিকার থাকতে পারে না। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। তিনি জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও প্রধান রূপেই পরিগণিত। মূলত সুদীর্ঘকাল ধরে রাজাকে কেন্দ্র করেই চাকমা-সমাজ গড়ে উঠেছে এবং আবর্তিত হয়েছে। অতীতে রাজা তাঁর মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের নিয়েই দেশ ও জাতির শাসন করতেন। এককালে চাকমা-সমাজে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে 'ধাবেং' এবং সেনাধ্যক্ষ হিসেবে 'চেগে' নামক দু'টি পদ ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এক একজন 'খীঝা' নামে সম্মানিত ব্যক্তি থাকতেন। তখন রাজা ধাবেং, চেগে ও খীঝাদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন।

মোগল আমলে (১৭৩৭–৫৮ খ্রি:) চাকমা সমাজে ধাবেং ও চেগে–এ দু'টি পদের বিলুপ্তি ঘটে এবং তৎক্ষেত্রে দেবান (দেওয়ান) পদটি চালু হয়। রানী কালিন্দীর রাজত্বকালে (১৮৪৪–৭৩ খ্রি:) তিনি দেবান পদের স্থলে তালুকদার পদের সৃষ্টি করেন। এটিও শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে নি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এসে এ স্থলে মৌজা প্রধান হিসেবে হেডম্যান (Headman) এবং গ্রামের প্রধান হিসেবে চাকমা–সমাজে 'কার্বারী' নামক নতুন একটি পদের চালু করা হয়। এ সময় খীঝা পদটি লুপ্ত হয়। ফলে বিগত তিন শত বছরে চাকমাদের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন মোটামুটি নিম্নরূপ ছিল বলে জানা যায় :

সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে	মোগল আমলে (১৭৩৭–৫৮ খ্রি:)	রানী কালিন্দীর আমলে (১৮৪৪–৭৩ খ্রি:)	(১৯০০ খ্রি:) থেকে)
রাজা	রাজা	রাজা	রাজা
|	|	|	|
ধাবেং	→ দেবান	→ তালুকদার	→ হেডম্যান
|	|	|	|
খীঝা	খীঝা	খীঝা	কার্বারী

সমাজ জীবনে রাজা, হেডম্যান, কার্বারী ব্যতীত বৌদ্ধ ভিক্ষু (ভন্তে) গেংগুলী (চারণ কবি) এবং ওঝারাও সম্মানের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

পূর্বে চাকমা সমাজে রাজাকে যথারীতি খাজনা প্রদান ছাড়াও চাকমাদেরকে প্রতিটি শিকারের একটি রাণ পাঠিয়ে দিতে হতো। যদি রাজবাড়ি অধিক দূরে হতো, তবে সে ক্ষেত্রে শিকারিকে রাজার পরিবর্তে তৎপ্রতিনিধি দেবান অথবা পরবর্তীকালে হেডম্যানদের কাছে শিকারের রাণ পাঠিয়ে দিতে হতো। তা না হলে তাকে জরিমানা করা হতো।

সচরাচর কোনো বন্যপ্রাণী শিকার করা হলে শিকারি তার শিকারের অর্থাৎ নিহত প্রাণীটির মাথা, চামড়া এবং কলিজাসহ এক তৃতীয়াংশ মাংস

পায়। পূর্বে ঐ শিকারের পিঠের একাংশের মাংস খীঝাদের প্রাপ্য ছিল। অবশিষ্ট মাংস শিকারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। এতে ঐ শিকারে নিয়ে যাওয়া প্রত্যেক বন্দুকের জন্য তাদের মালিকেরাও এক ভাগ করে পায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম শিকারটিকে দেখতে পায়, সে ঐ দলের সদস্য না হলেও এক ভাগ মাংস পেয়ে থাকে। পূর্বে চাকমাদের মধ্যে জমির কোনো বন্দোবস্তি ছিল না। সচরাচর গ্রামের চতুর্পার্শ্বের পাহাড়গুলোতে দেবান, খীঝা, তালুকদার ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের জুমের জন্য জায়গা নির্বাচনের পর বাদবাকি গ্রামবাসীরা তাদের জুমের জন্য স্থান নির্বাচন করতো। কোনো ব্যক্তি জুম চাষের জন্য একটি স্থান নির্বাচন করে 'সাগা' (এক জাতীয় চিহ্ন) দিলে অন্য লোকেরা ঐ স্থানে আর জুম চাষ করতো না ; একটি বাঁশের ফালা মাটিতে পুঁতে তার উপর আড়াআড়িভাবে আর একটি বাঁশের ফালা বেঁধে চিহ্ন দেওয়ার নাম 'সাগা'। একইভাবে বনে কেউ যদি প্রথমে বুনোওল, ব্যাঙের ছাতা, কলার কাঁদি, বাঁশ-কোড়াল, মধু ইত্যাদি দেখে সাগা (চিহ্ন) দেয়, তবে ঐ দ্রব্যগুলোর উপর তার অধিকার বর্তায়।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, সমাজ-জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য চাকমাদের বেশ কিছু উত্তম গুণাবলী রয়েছে। তারা আপদে, বিপদে, প্রাচুর্যে এবং অভাবের সময় একে অপরকে সাহায্য করে। এ কারণে দুর্ভিক্ষের সময়ও চাকমাদের মধ্যে কোনো ভিক্ষুক সচরাচর দেখা যায় না। গ্রামে রাস্তা-নির্মাণ, জঙ্গল-কাটা, থানমানা-পূজা, বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ ও পরিচালনা তারা যৌথভাবে করে। গ্রামের কোনো ব্যক্তি ধান-কাটা, ধান-ঝাড়া বা অন্য কোনো কাজে সাহায্য চাইলে গ্রামের লোকেরা তাকে ঐ কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এ জাতীয় গণ-সাহায্য চাওয়াকে চাকমা-সমাজে 'মালেইয়া ডাগানা' বলে। এভাবে যারা কোনো কাজে কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করে, ঐ ব্যক্তি পরবর্তীকালে তাদেরকে তার বাড়িতে ডেকে এনে একদিন ভোজে আপ্যায়িত করে।

মারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হলো মারমারা। বর্মি 'ম্রান্‌মা' অথবা 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটি বর্মি বংশজ অর্থে উদ্ভূত হয়েছে। মূলত তাদের আদি নিবাস বার্মা এবং আরাকানে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বর্মি এবং আরাকানিদের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের সমগোত্রীয় লোক কক্সবাজার এবং পটুয়াখালিতেও রয়েছে। তারা সেখানে নিজেদেরকে 'রাখাইন' হিসেবে পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী মারমাদের পরিবারগুলোর সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের লোকসংখ্যা প্রায় ১,২৯,৪৯০ জন। এখানে বান্দরবানে ও মানিকছড়িতে তাদের দুজন রাজা রয়েছেন। বান্দরবানের রাজাকে বোমাংরাজা এবং মানিকছড়ির রাজাকে মানরাজা বলা হয়।

মারমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং আমোদ-প্রমোদ প্রিয় লোক। তাদের মেয়েরা সাজগোজ করতে ভালোবাসে এবং বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় খোঁপা বাঁধে। মেয়েরা খুবই পরিশ্রমী এবং প্রায় সময়ই মেয়েদেরকে নানা ধরনের কাপড়-চোপড় তৈরি করতে দেখা যায়।

এই অঞ্চলটি বহুকাল পূর্ব থেকে তাদের কাছে পরিচিত হলেও অতীতে তারা তাদের দেশের উর্বর ভূমি ছেড়ে এসে এখানে বসবাসের কথা চিন্তা করেনি। Chittagong District Gazetter (১৯৭০ইং) থেকে জানা যায় যে, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেই ৯৫৩ সালের দিকে একজন আরাকানি রাজা সুলতিং চন্দ্র (৯৫১-৯৫৭ খ্রি:) চট্টগ্রাম জয় করে একটি বিজয়স্তম্ভে

'চইং-ত-গং' কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন। অনেকে উক্ত কথাগুলো থেকে চাটিগাম বা চট্টগ্রাম নামটি উদ্ভূত হয়েছে বলেও মনে করেন।

আরাকানিরা ঐ সময় চট্টগ্রাম অধিকার করলেও চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরাকানে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান নৃপতি রাজত্ব করেন। তখন আরাকানের যশ ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৬১২ সালের দিকে আরাকান তার চতুর্পার্শ্বের চট্টগ্রাম, পেগু এবং চাকমা রাজ্যটি অধিকার করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এসে আরাকানের পতন শুরু হয়। ঐ সময় ১৭৮৪ সালে বর্মিরাজ ভোদফ্রা আরাকান অধিকার করেন। এতে আরাকান চিরদিনের জন্য তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। হাজার হাজার আরাকানি শরণার্থী ঐ সময় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে পাড়িজমায়। ইংরেজদের রেকর্ড-পত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭৯৭ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে এই সব শরণার্থীর সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় হাজার হাজার শরণার্থী রোগে, শোকে ও খাদ্যাভাবে দেশান্তরী হওয়ার সময় মারা গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন কক্স তাদের সাহায্য করতে কক্সবাজারে যান, এখন তাঁর নামেই ঐ অঞ্চলটির নাম কক্সবাজার হয়েছে।

জনশ্রুতি মতে, ঐ সময় মারমারা দুটি প্রধান দলে এখানে প্রবেশ করেছিল। এর একটি দল বোমাংগ্রী কংহ্লুপ্রু ও সেতুংপ্রুর নেতৃত্বে প্রথমে রামু, ঈদগড় ইত্যাদি স্থান হয়ে পরে শঙ্খনদীর তীরে বান্দরবান শহরাঞ্চলে চলে আসে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। তাদের দ্বিতীয় দলটি আরাকানের পলইংখ্যাং থেকে ম্রাচাই নামক জনৈক সর্দারের নেতৃত্বে প্রথমে মাতামুহরী উপত্যকায় আসে ; পরে এই দলটি তাদের নেতার মৃত্যুর পরে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে ও তৎপরে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মানিকছড়ির আশেপাশে ঢুকে পড়ে। বর্তমানে তাদের মধ্যে মানরাজা নামে একজন রাজা রয়েছে। তারা এখনও নিজেদেরকে পূর্ববর্তী স্থান পলইংখ্যং-এর নামানুসারে পলইংসা দলের লোক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

অতীতে তারা এক একটি দল এক একজন সর্দারের অধীনে গ্রামে বাস করতো। এই জাতীয় গ্রাম্যপ্রধানকে মারমারা 'রোয়াজা' বলে। রোয়াজা, বোমাং বা রাজার নির্দেশে গ্রামবাসীদেরকে পরিচালিত করে। বান্দরবানের বোমাংরাজাদের একজন পূর্ব পুরুষদের নাম ছিল হারিও। তিনি আরাকানরাজ চান্দাউজিয়ার (১৭১১-৩১ খ্রি:) কাছে বোমাংগ্রী উপাধি পেয়েছিলেন। সেই থেকে এই রাজপরিবার 'বোমাং' উপাধি ব্যবহার করছেন।

সামাজিক রীতিনীতি

মারমারা সমাজ-জীবনে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে ভালোবাসে। তাদের সমাজে বহু রীতিনীতি পালিত হয়। এখানে স্বল্প পরিসরে এত সবের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই নিম্নে তাদের নামকরণ, বিবাহ ও মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ক মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা গেল।

মারমা শিশুদের নামকরণ

শিশু জন্মগ্রহণ করার কিছু পরেই শুভদিন দেখে মারমারা তার নামকরণ করে। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ঐ দিন ক্যাং-এ (বৌদ্ধ মন্দিরে) গিয়ে ভন্তেদেরকে (বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে) বাড়িতে আমন্ত্রণ করে মঙ্গলসূত্র শ্রবণ করে। একজন অভিজ্ঞ মারমা জ্যোতিষকে নাম নির্বাচনের জন্য ডাকা হয়। শিশুর নামকরণের বেলায় মারমারা তার পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনে। সচরাচর শিশুর দাদু-দাদীরা অথবা নানা-নানীরা তাদের নামকরণ করলে মঙ্গলজনক হয় বলেই প্রচলিত বিশ্বাস। এ কারণে শিশুর নামের সাথে শিশুটি ছেলে হলে দাদা বা নানার নাম যুক্ত করে এবং মেয়ে হলে সে ক্ষেত্রে দাদী বা নানীর নামের কোনো না কোনো অংশ যুক্ত করে তার নাম রাখা হয়। মারমাদের নামকরণে শিশুটি কোন বারে জন্মগ্রহণ করেছে তার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়, বিশেষত এ ব্যাপারে জ্যোতিষেরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শিশুটি পরিবারের প্রথম সন্তান হলে, সে পুত্রই হোক অথবা কন্যাই হোক তার নামের সামনে 'উ' যুক্ত করে দেয়া হয়।

আর শিশুটি যদি পরিবারে সকলের ছোট হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার নামের শেষে 'থুই' শব্দটি যুক্ত করে দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে মারমাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকেরা জ্যোতিষ ডেকে তাদের ছেলেমেয়ের জন্য কোষ্ঠী তৈরি করে রাখে। বিয়ের সময়ও অনেকে বর এবং কনের কোষ্ঠী যাচাই করে থাকে।

মারমা-নামকরণের একটি নমুনা

রাঙ্গামাটিস্থ বাংলাদেশ কুটির শিল্প সংস্থার কর্মকর্তা জনাব মং চিং মং এ সম্পর্কে জানান যে তাঁর জন্মের কোষ্ঠী আছে। এটি তালপত্রে বর্মিতে লিখিত। একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষ সেটি তৈরি করে দেন।

১. তার জন্মের পরে নামকরণ করা হয়েছিল থোঁয়াই-উ-চিং
২. বাল্যাবস্থায় তাঁর বর্মিক্লাসে একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নতুন নামকরণ করেন উ-চি-মং
৩. বাংলা মিডিয়ামে ভর্তির সময় লেখা হলো—মং-চিং-মং।

মং চিং মং মহোদয়ের দাদুর নাম মং থোঁয়াই। এ কারণে তাঁর বিশ্বাস তাঁর জন্মের পরে কোষ্ঠি প্রস্তুতের সময় তাঁর নামকরণে থোঁয়াই শব্দটি সংযোজিত করে থোঁয়াই-উ-চিং রাখা হয়েছিল। তিনি রবিবারে জন্মেছিলেন। উপরোক্ত তিনটি শব্দের মধ্যে একটি সম্ভবত 'চিং' শব্দে রবিবারটির সাথে শব্দগত যোগাযোগ থাকতে পারে ; তিনি পিতার প্রথম সন্তান তাই তাঁর নামের সাথে 'উ' শব্দটি যুক্ত করে থোঁয়াই-উ-চিং নামটি রাখা হয়েছিল। অনেকে যেমন পরিবারের প্রথম সন্তান মেয়ে হলে উ-স্মা-মা জাতীয় নাম রাখেন। আবার অনুরূপভাবে নবজাতক যদি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হয় তবে তার নামের শেষে 'থুই' শব্দটি যুক্ত করে দেয়া হয়। যেমন মং মা থুই ইত্যাদি।

মারমা বিয়ের রীতিনীতি

মারমাদের জীবন হাসি ও আনন্দে পরিপূর্ণ। তারা নাচ, গান এবং আমোদ-প্রমোদ ভালোবাসে। বিভিন্ন ধর্মীয় এবং জাতীয় উৎসবগুলোতে দলে দলে

মারমা তরুণ-তরুণীরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। জীবনের অজস্র ঘাটে ঘাটে এবং পথে পথে তাদের দেখা সাক্ষাৎ এবং মন দেয়া-নেয়ার পালা চলে। তারা একসাথে নদীতে মাছ-কাঁকরা ধরতে যায়, জুম্মে চাষাবাদ করতে যায় এবং ধর্মীয় দিনগুলোতে মন্দিরে গিয়ে গৌতম বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে আসে। এরপর একদিন যার যার মনমতো জীবনসঙ্গীকে বেছে নেয়। R. H. S. Hutchinson কর্তৃক লিখিত Chittagong Hill Tracts District Gazetteer (1909) গ্রন্থটি থেকে মারমাদের বিয়ে সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদির কিছু অংশ :

সচরাচর অভিভাবকেরাই ছেলের পছন্দ করা পাত্রী দেখতে যায় অথবা কখনও কখনও নিজেরাও উদ্যোগী হয়ে ছেলের জন্য পাত্রীর খোঁজ করে। উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ বয়স্ক কোনো আত্মীয়কে পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে এক বোতল মদ ও অন্যান্য উপহার দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানো হয়। এই মদের বোতল পাত্রীর বাবার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিতে হয়। ঐ ব্যক্তির সাথে আরও কিছু লোক পাঠানো হয়। ঐ দলে রীতি অনুযায়ী বেজোড়া সংখ্যক লোক থাকে অর্থাৎ দলে লোকসংখ্যা এক, তিন, পাঁচ, সাত এভাবে ঠিক করা হয়। তাদের যাত্রা শুভ করার জন্য সাথে কোনো বিধবা বা বিপত্নীক নেয়া হয় না।

প্রথমবারে পাত্রীর অভিভাবকেরা যদি আকারে ইঙ্গিতে হাঁ সূচক মনোভাব ব্যক্ত করেন, তবে পাত্রের অভিভাবকেরা দ্বিতীয়বারের জন্য লোক পাঠাতো। দ্বিতীয়বারে তারা পাত্রীর বাবার জন্য একটি সিদ্ধকরা মুরগী, আলু এবং শুটকি নিয়ে যেতো। উল্লেখ্য, ঐ মুরগীটিকে রীতি অনুযায়ী গলা টিপে মারার পর সিদ্ধ করা হতো। বর্তমানে এই জাতীয় প্রথা বহুলাংশে লোপ পেয়েছে। পূর্বে বর ও কনে নির্বাচনের বেলায় তাদের ভবিষ্যত দাম্পত্য জীবন সুখের অথবা দুখের, কোনটি হবে ইত্যাদি পূর্বাহ্নে জানার জন্য মারমা সমাজের বুড়োবুড়িরা জ্যোতিষী ডেকে পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠীর গণনা করতো।

(ক) এ সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাক্তন সংসদ সদস্য, চাই থোয়াই রোয়াজা বলেন যে, বিয়েতে রবিবারের জাতকের সাথে বৃহস্পতিবারের জাতিকার মিল হয় না। শনিবারের সাথে বুধবারের, সোমবারের সাথে

বৃহস্পতিবারের জাতক-জাতিকারদের মিল হয় বলে সমাজে এ-জাতীয় বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। আবার শনিবারের জাতক-জাতিকাদের সাথে বৃহস্পতিবারের জাতক-জাতিকাদের মিল হয়। তারা স্বপ্ন দেখাতেও বিশ্বাস করতো। যেমন তারা স্বপ্নে ফুল, গাছে চড়া, নদী পার হওয়া, পাহাড়ে উঠা, সাদা জিনিস ইত্যাদি দেখাকে মঙ্গলজনক মনে করতো এবং স্বপ্নে ভাঙ্গা কলসি, ভাঙ্গা পাত্র, ক্রন্দনরত স্ত্রীলোক, লাল জিনিস ইত্যাদি দেখাকে অমঙ্গলজনক মনে করতো। যাহোক, গণনায় এবং স্বপ্নে সব কিছু ঠিকমতো হয়ে থাকলে পাত্র-পাত্রীর বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। রীতি অনুযায়ী কনের বাবা বরের বাবার কাছে তার মেয়ের জন্য মানানসই কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার-পত্র এবং অন্যান্য জিনিস দাবি করে থাকেন। বরের বাবা তার সামর্থ অনুযায়ী ঐগুলো পূরণের চেষ্টা করেন।

(খ) তিনি আরও বলেন যে, হাচিনসন বর্ণিত মারমা বিয়ের রীতিনীতির কথা, তিনি বুড়োবুড়ীদের মুখে শুনেছেন তবে আজকাল এর অনেকগুলো প্রথাই লোপ পেয়েছে।

পূর্বে কনের বাবা তার আত্মীয়-স্বজনদের একটি তালিকা বরের বাবার কাছে পাঠাতেন। রীতি অনুযায়ী বিয়ের পূর্বে তাদের প্রত্যেকের কাছে বরের বাবাকে এক বোতল মদ, একটি সিদ্ধ করা মুরগী, একটি রৌপ্য টাকাসহ বিবিধ উপঢৌকন পাঠাইতে হতো। তবে R. H. S. Hutchinson -এর লেখা (১৯০৬ইং) থেকে জানা যায়, ঐ সময় কেবল টোকেনস্বরূপ একটি টাকাই পাঠানো হতো ; যা কনের আত্মীয়দের হাতে হাতে ঘুরতো অর্থাৎ একজন আত্মীয় টোকেনস্বরূপ ঐ টাকা নেয়ার পর তা আবার বরের বাবার কাছে ফেরত পাঠাতেন। তখন পুনরায় ঐ টাকাটি কনের অন্য কোনো আত্মীয়ের কাছে অনুরূপভাবে পাঠানো হতো।

এরপর বিয়ের দিনক্ষণ এগিয়ে এলে বিয়ের দু'দিন পূর্বে বরের বাড়িতে পরিবারের মঙ্গল কামনা করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে 'চুং-মং লেহ্' পূজা করা হতো। ঐ পূজায় ১টি শুকর ও ৫টি মোরগ-মুরগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়। ঐ দিন রীতি অনুযায়ী অনেকে বর ও কনেকে নূতন পোশাক

পরিয়ে সুন্দর স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুমাতে পাঠাতো। হাচিনসনের বর্ণিত উপরোক্ত প্রথাসমূহের অনেকগুলোই বর্তমানে মারমা সমাজে অনুপস্থিত।

এদিকে বিয়ের পূর্বে গ্রামের যুবকরা সবাই মিলে ক'দিন পূর্বে কনের বাড়ির সামনে একটি পান্থশালার মতো ঘর (চারেইক) তৈরি করে। ঐ ঘরে বিয়ের পূর্বে বর বেড়াতে এসে বিশ্রাম করে এবং কনের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিচিত হয়। কনের বাবা তাকে সাহায্যকারী ঐ যুবকদেরকে ভোজে আপ্যায়িত করেন। বিয়ের একদিন পূর্বে বরের বন্ধুরা তাকে পাল্কিতে চড়িয়ে বেশ ফুর্তির সাথে ঐখানে নিয়ে যায়। বর সেখানে বসে কনের আত্মীয়দের সাথে পরিচিত হয় এবং সন্ধ্যায় পাল্কিতে চড়ে কনের আত্মীয়দের বাড়ির দিকেও যায়। সেখানে তাদেরকে খুব আদর আপ্যায়ন করা হয়। উপরোক্ত চারেইক বর্তমানে কেবল বান্দরবান ও কক্সবাজারের দিকে দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে এটি অনুপস্থিত। বান্দরবানে মারমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান বসে কনের বাড়িতে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মারমা'রা ছেলের জন্য বাড়িতে বউ নিয়ে যায়। বান্দরবানে বিয়ের দিন সন্ধ্যায় বরকে পাল্কিযোগে চারেইকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে বেশ কিছুক্ষণ তার আগামী জীবনের স্বপ্নে বিভোর থাকে। তারপর শুভক্ষণ এসে উপস্থিত হলে সে সবান্ধবে কনের বাড়ির দিকে রওনা হয়। সেখানে একটি পাটির উপর উপবেশনের জন্য একটি সুন্দর চাদর বিছানো থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে কলাপাতর উপর একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখা হয় ; ওটির গলায় সাদা সুতা পেঁচানো থাকে এবং মুখে আম্রপল্লব রাখা হয়। আর ঐ সুতাকে মঙ্গলের ধারক মনে করা হয়। একটি পাত্রে বিনিচালের ভাত এবং আরও একটি পাত্রে বিনিধানের খৈ নিয়ে আসা হয়। বর ও কনেকে আশীর্বাদের সময় বিয়েতে পৌরোহিত্যকারী ওঝা এবং অন্যান্য উপস্থিত আত্মীয়েরা ঐখান থেকে খৈ নিয়ে তাদের মাথায় ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে। বিয়ের অনুষ্ঠানে থালায় করে এক বা একাধিক আস্ত সিদ্ধ করা মোরগ-মুরগীও নিয়ে আসা হয়। একটি থালায় বর ও কনের জন্য খাবার থাকে, যা তারা থালার দু'প্রান্ত থেকে খেতে শুরু করে। কোনো একসময় দুজনের হাতে হাতে মিলন হলে তাদের খাওয়া হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বিয়ের আসরে দু'বোতল

মদও আনা হয়। রীতি অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর নিমন্ত্রিত অতিথিরা তা থেকে গ্লাসে করে অল্পসল্প মদ পান করেন। কোনো পুরুষ যদি তাতে অভ্যস্ত না থাকেন, তবে অন্তত তাঁকে গ্লাসে আঙ্গুল ডুবিয়ে জিহ্বায় ঐ পানীয়ের একটু স্পর্শ হলেও লাগাতে হবে। এতে অনুষ্ঠানের আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

বিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্যায়ে কনে বরের পাশে বসে। একজন ওঝা বিয়ের সময় সেখানে রাখা জলপাত্রের মুখ থেকে আম্রপল্লব হাতে নিয়ে তাদের শিরে ৫/৭ বার পবিত্র জল ছিটান এবং মন্ত্রপাঠ করেন। এই পর্যায়ে তিনি বরের ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলের সাথে কনের বাম হাতের কড়ে আঙ্গুল দুটি মিলিয়ে দিয়ে, তাতে আস্তে আস্তে পবিত্র জল ঢেলে বলতে থাকেন, "ওমুকের ছেলে ওমুকের সাথে ওমুকের আজ ওমুক দিন অতটায় বিয়ে হচ্ছে। আপনারা সবাই আশীর্বাদ করুন" ইত্যাদি বলে তাদের বিয়ে দেন। তিনি তার মুঠিতে বিনিধানের খৈ নিয়ে ঐগুলো তাদের মাথায় দিয়ে তাদেরকে আশীর্বাদ করেন। তখন উপস্থিত সবাই সাধুবাদ দেন। এরপর নবদম্পতি বিয়ের আসন থেকে উঠে প্রথমে কনের পিতা-মাতাকে এবং পরে বরের পিতা-মাতাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। তারা বিয়েতে উপস্থিত অন্যান্য গুরুজনদেরও আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এসব পালা চুকে গেলে খাওয়া এবং ফুর্তির ধূম পড়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মারমারা সম-সম্পর্কে (inequal generation) বিয়ে করে।

উল্লেখ্য যে, মারমা সমাজে চাচাতো এবং খালাতো উভয় সম্পর্কের বোনদেরই বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

মারমা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মারমা সমাজে কোনো লোক মারা গেলে তৎক্ষণাৎ আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়া হয়। প্রথমে মৃতকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। বৌদ্ধভিক্ষুরা এসে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে সুত্র (মন্ত্র) পাঠ করেন। মৃতের

আত্মীয়স্বজনেরা তার জন্য সাধ্যমতো দান-দক্ষিণা করে দেয়া ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হলে মৃতকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত লোকটি ধনী অথবা গণ্যমান্য কেউ হলে তাকে রথে চড়িয়ে দু'দল লোক দুদিকের দড়ি ধরে টানাটানি করে ; এদের একদল স্বর্গপক্ষের এবং অন্যদল বিপক্ষের (নাগরাজ বা যমের দল)। এতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত সব সময় স্বর্গ পক্ষেরই জয় হয়ে থাকে।

মৃত লোকটি পুরুষ হলে চিতায় তিন স্তর কাঠ সাজানো হয় এবং স্ত্রীলোক হলে চার স্তর কাঠ সাজানো হয়। এরপর প্রধান পুরোহিত মৃতের (পুরুষ হলে) মাথার পাগড়ি হাতে ধরে তার শিয়রে মন্ত্রপাঠ করে তার আত্মার সদগতি কামনা করেন (Hutchinson 1906)। ঐ সময় চিতার চার কোণায় দাঁড়িয়ে চারজন লোক মৃতের উপর মন্ত্রপূত পবিত্র জল ছিটায়। এসব অনুষ্ঠানাদি হয়ে গেলে মৃতের নিকটস্থ কোনো একজন আত্মীয় তার চিতায় প্রথম অগ্নি সংযোগ করে। তারপর অন্যান্যরা একে একে তাতে অগ্নি সংযোগ করে। অতঃপর মৃতদেহটি পুড়ে গেলে সবাই নদীতে গিয়ে স্নান করে যার যার বাড়ি চলে যায়।

চিতা নিভে গেলে ঐখানে উপস্থিত কর্মীরা ছাইগুলো মাটি চাপা দেয়। পরে সেখানে লম্বা লম্বা বাঁশ পুঁতে সেগুলোর মাথায় 'ট্যাংগোন' (এক জাতীয় সাদা রঙের লম্বা কাপড়) উড়িয়ে দেয়।

এর সাতদিন পরে মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা পুনরায় বৌদ্ধভিক্ষুদের ডেকে তার নামে দানধর্ম করে দেয় এবং গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়।

ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হলো ত্রিপুরারা। কেউ কেউ তাদেরকে টিপরা বা তিপারা লিখে থাকেন। এখানে বান্দরবান জেলায় উসুই নামে ত্রিপুরাদের আরও একটি দল রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরাদের পরিবারগুলোর সংখ্যা থেকে জানা যায় যে তাদের জনসংখ্যা (তাদের রিয়াং দলের লোকদেরসহ) প্রায় ৫৭,৩৬৮ জন আর তাদের উসুইদের জনসংখ্যা হলো ৪,২৩২ জন। এই হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা হলো মোট ৬১,৬০০ জন।

ত্রিপুরারা বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড় অঞ্চলেও বসবাস করে, তাদের আদিনিবাস হলো ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে। মূলত তারা সেখান থেকেই এই অঞ্চলে এসেছিল। একটি জনশ্রুতি মতে অতীতে ত্রিপুরা-রাজ রত্নমাণিক্যের সময় (১৪৬৩-৬৭ খ্রি:) ত্রিপুরাদের রিয়াং দলের লোকেরা মাইয়ুনী নদীর তীরে বাস করতো। তারা রাজা কর্তৃক অতিরিক্ত করের চাপে ঐ সময় মাইয়ুনী (ট্লাং) অঞ্চল ছেড়ে কর্ণফুলী উপত্যকায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ গোবিন্দ মাণিক্যও (১৬৬০-৬৬ খ্রি:) রিয়াংদের উপর প্রথম দিকে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে কয়েকবার সৈন্যও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ১৬৬১ সালে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে ছত্রমাণিক্যের সাথে তাঁর বিরোধ দেখা দিলে তিনি নিজেই সপরিবারে রিয়াংদের এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে তাঁর নির্বাসিত জীবনের সময়

দিঘিনালার দিঘিগুলো (১২টি দিঘি) খনন করা হয়েছিল বলে লোকে মনে করে।

Chittagong Hill Tracts District Gazetteer (1906)গ্রন্থের লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক R. H. S.Hutchinson তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, উসুইরা কিলাই ও মংলাই নামক দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে রাজা উদয়গিরির সময় (সম্ভবত ত্রিপুরা রাজা উদয় মাণিক্যের সময় ১৫৬৭ খ্রি:?) বান্দরবানের মাতামুহুরী নদীর তীরে চলে গিয়েছিল। তারা এখনও সেখানে বসবাস করছে।

ত্রিপুরারাও অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে তাদের নিজস্ব কিছু দেবদেবীও রয়েছে। সচরাচর তারা চৌদ্দ জন বিশিষ্ট দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে 'অচাই' নামক এক শ্রেণীর পুরোহিত তাদের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য দান করেন। সাম্প্রতিককালে তাদের উসুইদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রিপুরাদের তিনটি প্রধান দল রয়েছে। এগুলো হলো : তিপারা, রিয়াং এবং উসুই। সচরাচর তাদের সমাজে ত্রিপুরারা ৩৬ দফায় (দলে) বিভক্ত বলে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে।

গোত্র ও জ্ঞাতি সম্পর্ক

ত্রিপুরাদের বিভিন্ন দফাগুলো আবার কতগুলি গোত্র বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এখানকার নাইতং দফার মধ্যে নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলো পাওয়া যায়।

১. মাইপালা : এই বংশের জনৈক পূর্ব-পুরুষ নাকি রাজার বিয়েতে ভাত তরকারি মেহমান-দের বিতরণ করেছিল। ত্রিপুরা ভাষায় 'মাই' অর্থ ভাত।

২. লিগা : ঐ বিয়েতে ওঝাগিরি করে লিগা-ওছাই অর্থাৎ লিগানামক ওঝা। তার বংশ-ধরেরাই হলো লিগাগোষ্ঠীর লোক।

৩. কোয়াইতিয়া : এ বিয়েতে মেহমানদেরকে পানসুপারি বিতরণ যিনি করেন, তিনি হলেন কোয়াইতিয়া। ত্রিপুরা ভাষায় 'কোয়াই' অর্থ সুপারি।

৪. সেংক্রা : এই বংশের পূর্ব-পুরুষ তরোয়াল (সেংক্রা)-ওয়ালা ছিলেন। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি হলো—
৫.কাপিং ৬. নাইতং ৭. মাহিং এবং ৮. দৈচিং—উল্লেখিত গোষ্ঠীগুলো আবার কতগুলো উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। যথা—মাইপালা গোষ্ঠীর উপগোষ্ঠীসমূহ—

১. মুরুং চুকুং (মাইপালা) : এই বংশের পূর্ব-পুরুষ ডাকিনী বিদ্যায় ওস্তাদ ছিল। মারমা ভাষায় 'ম্রং' অর্থ ত্রিপুরা এবং 'চুকুং' অর্থ ডাকিনী।

২. মাইমিলাক (মাইপালা) : এই বংশের পূর্ব-পুরুষের কথা বলার ভঙ্গী নাকি বিনি ধানের (ভাতের) আঠার মতো জড়তাগ্রস্ত ছিল।

৩. দবদবি (মাইপালা) : এই বংশের পূর্ব-পুরুষেরা ধন এবং প্রতিপত্তিশালী ছিল। চাকমা ভাষায় 'দবদবি' অর্থ প্রতিপত্তি বুঝায়।

৪. কেলাবাড়িয়া (মাইপালা) : এই বংশের পূর্ব-পুরুষের বিরাট একটা কলা বাগান ছিল।

৫. সিকাম (মাইপালা) : ত্রিপুরারা কুকিচীন দলের লোকদেরকে 'সিকাম' বলে। একবার এ সমস্ত দুর্ধর্ষ লোকেরা একটি ত্রিপুরা গ্রাম আক্রমণ করে যাওয়ার সময় একটি ছেলে ধরে নিয়ে যায়। পরে ছেলেটি বড় হলে তারা তাকে স্বস্থানে ফেরত পাঠায়। ওই ছেলের বংশের লোকেরাই হলো সিকাম (মাইপালা)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরাদের অন্যান্য গোত্রগুলোও এভাবে বিভিন্ন উপগোত্র বা উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। সম্ভবত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কর্ম এবং পেশাকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরাদের উপগোত্রগুলোর নামকরণ হয়েছে।

জ্ঞাতি সম্পর্ক

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমাজগুলিতে একমাত্র ত্রিপুরাদের মধ্যেই বেশ কয়েকটি গোত্রে bilineal (দ্বি-ধারায়) বংশ গণনা করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। এতে একজন পুত্র সন্তান তার পিতার দফা (দল) ও গোত্রের অধিকারী হয়। আবার একই পিতার ঔরসজাত কন্যা সন্তান তার মায়ের দফা (দল) ও গোত্রের অধিকারী হয়। এ বিষয়ে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির হিসাবরক্ষক মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা জানান যে, ত্রিপুরাদের দেনদাক, ফাতং, খালিসহ বেশ কয়েকটি গোত্রে এই দ্বি-ধারায় (bilineal) বংশ গণনা করার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ত্রিপুরাদের আসলং-দফার মেয়েরা নাকি সবসময় মাতৃধারায় (Matrilineal)বংশ গণনা করে অর্থাৎ ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক মায়ের চোখে ওদের পিতা যে জাতি বা গোত্রেরই হোক না কেন, ছেলে-মেয়েরা আসলং-দফার লোকই। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, ত্রিপুরাদের মতো অন্যতম বোডো (Bodo) ভাষী গারোদের মধ্যেও মাতৃধারায় বংশ গণনার রীতি প্রচলিত। তারা এক্ষেত্রে 'মাদং' শব্দটি ব্যবহার করে, যা ত্রিপুরা-ভাষায় 'মাসং' হিসেবে পাওয়া যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় উপজাতীয় লোকেরাই কম- বেশি বহির্গোত্রে বিয়ে করে। ত্রিপুরাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয় বিষয়। তারা প্রায়ই নিজ দফায় এবং কখনও কখনও স্বগোত্রে বিয়ে করে। এ কারণে তাদের ভাষায় জ্ঞাতি সম্বোধনসূচক শব্দগুলিতেও তার ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় : যেমন—তারা পিসী, কাকী, মামী, মাসী এদের সবাইকে 'আনই' বলে সম্বোধন করে এবং পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'ননই' হিসেবে পরিচয় দেয়। একইভাবে তারা কাকা, পিসা, মেসো এদের সবাইকে 'আতই' বলে সম্বোধন করে এবং পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'ততই' হিসেবে পরিচয় দেয়।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আত্মীয়দের অবস্থান সম্পর্ক মোটামুটি নিম্নরূপ :

পিসী=মাসী=কাকী=মামী = 'ননই'

পিসা=মেসো=কাকা=মামা = 'ততই'।

উপরের বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এই যে, ত্রিপুরাদের মতে আন্তঃগোত্রে বিবাহ করার রীতি এককালে খুবই বলবৎ ছিল। বর্তমানে ত্রিপুরা সমাজ সম্ভবত দ্বি-ধারায় বংশ গণনা পদ্ধতি (bilineal) থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্টতই পিতৃধারায় বংশ গণনার প্রতি নিশ্চিতভাবে এগুচ্ছে।

রিয়াংদের সামাজিক কাঠামো

পূর্বে রিয়াংদের মধ্যে তাদের নিজস্ব একটি সামাজিক কাঠামো ছিল বলে মনে হয়, যা এখন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াংদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। রিয়াংরা তাদের সমাজের প্রধান ব্যক্তিকে 'রায়' এবং প্রধান মন্ত্রীকে 'কাচাক' বলে। রায়ের 'চাপিয়াখাঁ' এবং 'চাপিয়া' নামক দু'জন সহচর থাকে। তারা তিনজনে মিলে একটি পরিষদ গঠন করে। তবে রিয়াং সমাজে কোনো কোনো সময় রায়ের চেয়ে কাচাকের ক্ষমতা অধিক দেখা যায়। অতীতে এখানকার রিয়াং সমাজও সম্ভবত রায় ও কাচাককে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কোনো এক সময় রিয়াংদের ঐ সামাজিক কাঠামো প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে লুপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়।

বর্তমানে গ্রামদেশে ত্রিপুরা সমাজে রোয়াজা, ধাবেং, মুরচুই ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দেখা যায়। গ্রামের প্রধান হলেন 'রোয়াজা'। অন্য দুজন হলেন তাঁর সহচর। গ্রামবাসীরা উপযুক্ততা দেখে এসব ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন। এ সম্পর্কে মহেন্দ্রলাল ত্রিপুরা বলেন যে, কোনো ব্যক্তি রোয়াজা হ'তে চাইলে তাকে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সভা ডাকতে হয়, একটি অনুষ্ঠানে ঐদিন ত্রিপুরাদের আরাধ্য ১৪জন দেবদেবীকে প্রথমে পূজা দেয়া হয়। তৎপরে গ্রামবাসীরা রোয়াজা ও তৎসঙ্গী ধাবেং এবং মুরচুই

পদপ্রার্থীদ্বয়কে তিনটি নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে তাদেরকে মাল্যভূষিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়। বলাবাহুল্য ঐ অনুষ্ঠানের $\frac{১০}{১৬}$ অংশ রোয়াজা পদপ্রার্থীকে এবং $\frac{৬}{১৬}$ অংশ বাকি দুজন পদপ্রার্থীকে বহন করতে হয়। গ্রামের যে কোনো পূজা অনুষ্ঠান ও বিচার-আচারাদিতে এসব ব্যক্তি সম্মান পেয়ে থাকেন।

জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠান

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে উষ্ণজলে স্নান করানোর পর মুখে মধু দেয়া হয়। ডলু বাঁশের ধারালো একটি টুকরা ফালি দিয়ে শিশুর নাভীটি কেটে সুতা দিয়ে বাঁধা হয়। আর ওটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকায় তজ্জন্যে এর মুখে মেটো সিঁদুর বা কাপড় পোড়া ছাই লাগিয়ে দেয়া হয়। 'দিব্' নামক একটি বাঁশের টুকরা শিশুটির জন্মস্থানে পুঁতে 'পথিলিমা' নামক একজন দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেয়া হয়। শিশুটির নাভী শুকিয়ে গেলে একদিন ওঝা ডেকে বাড়ির লোকেরা 'ঘিলা-কজই' ও সোনারূপার পানি শিরে ও দেহে ছিটিয়ে পবিত্র হয়। এভাবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রসূতিকে অশুচি মনে করা হয়। ঐ সময় পর্যন্ত প্রসূতিকে অশুচি মনে করা হয়। ঐ সময় পর্যন্ত তাকে রান্নাবান্না করার উপকরণাদি স্পর্শ করতে দেয়া হয় না।

অতঃপর একদিন সুবিধা মতো শিশুটির মাতাপিতা গ্রামের যে কোনো রাস্তার দু'মাথায় গিয়ে একটি ডিম দিয়ে লাম্প্রা-মাতাই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে আসে। তারা নদীতে গিয়ে জলদেবী গঙ্গাকেও একটি মোরগ বলি দেয় এবং শিশুটির জন্মলগ্নে সাহায্যকারী ব্যক্তিদেরকে একটি ভোজে আপ্যায়িত করে। খানাপিনার পর একটি অনুষ্ঠানে শিশুটির মা, শিশুটিকে ধাইয়ের কোলে তুলে দেয়। রীতি অনুযায়ী শিশুটির মা, ধাইয়ের হাতে এক বোতল মদ, নতুন একখানা কাপড় ও নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে শিশুটিকে ধাইয়ের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং ধাইকে প্রশ্ন করে, "আপনার পারিশ্রমিক বুঝে পেয়েছেন কি?" ধাই ঐ সময়, "হ্যাঁ পেয়েছি" বলে শিশুটিকে মায়ের কোলে তুলে দেয়।

নামকরণ

এই অনুষ্ঠানে ৫/৭টি মাটির প্রদীপ আনা হয়। প্রত্যেক প্রদীপের বরাবরে এক একটি নাম প্রস্তাব করা হয়। এরপর একসাথে সবগুলো প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। রীতি অনুযায়ী যে প্রদীপটি সর্বাধিক জ্বলতে থাকে শিশুটির জন্য ঐ প্রদীপ বরাবরে প্রস্তাবিত নামটি রাখা হয়। এতে ভবিষ্যৎ জীবনে ঐ নামটিই তাকে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু করবে বলে বিশ্বাস করা হয়। ত্রিপুরাদের এই নামকরণ অনুষ্ঠানটি মারমাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বলে অনেকে মনে করেন।

বিবাহ

সাধারণত ছেলের অভিভাবকেরাই কনে পছন্দ করেন। তবে বহু ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরাই পরস্পরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। বিয়ের দিন-তারিখ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে শুভদিনে বরযাত্রীরা বরের বাড়িতে 'কাথারকমাতাই' দেবতার উদ্দেশ্য আয়োজিত পূজায় প্রণাম নিবেদনের পর একসঙ্গে রওনা হয়। বরযাত্রীদলে একজন সধবা মহিলাসহ দুজন বালক ও দুজন বালিকা থাকে। কনের বাড়িতে পৌঁছলে তাদেরকে সাদরে আপ্যায়ন করা হয়। ঐ দিন কনের বাড়ির সদর দরজার দুপাশে বাঁশের খণ্ড পুঁতে ঐগুলোর মুখগুলো খাঁচার মতো বোনা হয় এবং তাতে লাউয়ের খোলে পানি রাখা হয়। আর লাউয়ের গলায় মারছাড়া সুতা পেঁচানো থাকে। বরযাত্রীরা কনের বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পর কনেকে সাজিয়ে বাড়ি রওনা হয়। বরযাত্রীরা বউ নিয়ে বরের বাড়িতে পৌঁছলে সেখানে তাদেরকে যথারীতি ভিতরে নেওয়া হয়। এরপর যথাসময়ে বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে বর ও কনে পাশাপাশি বসে। বরের পাশে পূর্বোক্ত দুজন বালিকা বসে। তাদের জন্য থালায় খাবার আনা হয়, যা তারা অনুষ্ঠানের পর খায়। অনুষ্ঠানে এক জোড়া কলাপাতায় দু'মুঠো ভাত, দুটি মোরগ ও মুরগীর রান এবং দুটি চোঙ্গায় মদ থাকে। একটি থালায় তুলা এবং চাউল রাখা হয়, যা দিয়ে পরে তাদেরকে আশীর্বাদ করা হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানে ওঝা একটি পাত্র থেকে তুলা ও চাউলের উপর কয়েক ফোটা পানি ছিটিয়ে 'সুকুন্দ্রাই-বুকুন্দ্রাই' দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে। আর সে তুলাসহ চাউলগুলো বর ও কনের মাথার উপর সাতবার ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে দেয়। সে তাদের জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করে। তুলায় সামান্য চাল ও মুখে থুথু শব্দ করে তাঁদের মস্তকে স্পর্শ করায় এবং একটি সাদা কাপড় দিয়ে দুজনের কোমর জড়িয়ে জোড় বেঁধে দেয়। এরপর উপস্থিত বুড়োবুড়ীরা তুলা ও চাউল দিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে।

ত্রিপুরাদের মধ্যে দফা ও গোত্রভেদে বিয়ের আচার অনুষ্ঠানাদিতে পার্থক্য রয়েছে। এতক্ষণ ধরে যে ধরনের বর্ণনা দেয়া গেল, তা ত্রিপুরাদের নাইতং দফার মাইপালা গোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা যায়। তবে ফাতুং দফার মধ্যে প্রায়ই যুবক-যুবতীরা নিজেদের পছন্দমতো সঙ্গীকে বিয়ে করে। এ-ক্ষেত্রে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা যদি গোপনে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এবং যুবকটি তার সঙ্গিনীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই সে স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ত্রিপুরা সমাজে কোনো লোক মারা গেলে তার মরদেহ উঠানে নামিয়ে স্নান করানোর পর তাকে নতুন কাপড় পরানো হয়। রাতে তার শিয়রে বাড়ির মাটির প্রদীপ জ্বেলে দেয়। তার জন্য একটি মুরগীর বাচ্চা কেটে রান্না করে ভাত তরকারির সাথে কলাপাতার উপর তাকে ঐগুলো দেয়া হয়। পরদিন মৃতদেহকে 'চথু' নামে একজাতীয় বাঁশের বাহনে তুলে শ্মশানে নেয়া হয়। ঐ বাহনের সাথে বাঁশের একটি ছাতা ও দু'গ্রন্থিযুক্ত চুফুং' নামে একটি বাঁশের চোঙ্গাও থাকে। মৃতের জন্য একটি ঝুড়িতে করে দা, কাস্তে, কলসী, কত্তি (একজাতীয় জলের পাত্র) ইত্যাদি নেয়া হয় এবং মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে সেক্ষেত্রে তার জন্য কোমরে তাঁতের সরঞ্জামাদিও থাকে। এরপর মৃতের বাড়ি থেকে শ্মশান পর্যন্ত একটি মারহীন সুতা নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃতলোকটি পুরুষ হলে শ্মশানে চিতা প্রস্তুতের বেলায় পাঁচ স্তর কাঠ এবং স্ত্রীলোক হলে সাত স্তর কাঠ সাজানো হয়ে থাকে। শব বহনকারীরা

শ্মশানে পৌঁছে মৃতকে সাতবার শ্মশান প্রদক্ষিণ করানোর পর তাকে প্রণাম জানিয়ে উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বি করে চিতায় তুলে দেয়। চিতাস্থানে মৃতের শিয়রে একটি চৌকোণা গর্ত খনন করে তাতে পানি ভর্তি করে কাঁচা হলুদের টুকরো ছেড়ে দেয়া হয়। এর পার্শ্বে বাঁশের টুকরো মাটিতে পুঁতে ছাতা বেঁধে দিয়ে তার চারপাশের পাতাযুক্ত বাঁশের আগা পোঁতা হয়। রীতি অনুযায়ী মৃতের আত্মীয়েরা পাঁচ টাকা দিয়ে চিতা প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে চিতার কাঠগুলো কিনে নেয়। ওঝা মৃতের শিয়রে রক্ষিত পানিপূর্ণ বাঁশের চোঙ্গাটি নিয়ে মন্ত্র পড়ে মৃতের আত্মীয়দের হাত ধুয়ে দেয় এবং মৃতের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে। এরপর মৃতের প্রত্যেক আত্মীয় বাম হাতে এক গুচ্ছ কাঠ নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে, মৃতদেহ পুড়ে গেলে ওঝা মৃতের খুলি থেকে সামান্য মগজ একটি বাঁশের চোঙ্গায় তুলে তা তার দেহের পিছনে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। এর নাম ত্রিপুরা ভাষায় 'সিমতুম'। অতঃপর সবাই শ্মশান থেকে বাড়ি ফেরার সময় নদীতে কাপড়-চোপড়সহ স্নান করে বাড়িতে যায়। এ সময় প্রত্যেক বাড়ির সামনে অপদেবতা তাড়ানোর জন্য একটি পাত্রে আগুন দেয়া থাকে। লোকেরা নদীতে স্নানের পর বাড়িতে ওঠার আগে ঐ পাত্রের আগুনে হাত সেঁকে নেয় এবং সোনারূপা ও 'ঘিলাকুঁচ'-এর পানি দিয়ে পবিত্র হয়। মৃতের বাড়িতে কেউ ফিরলে ঐ সময় মদ ও লবণযুক্ত আদা খায়।

কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ছোঁয়াচে ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে কেউ মারা গেলে তাকে প্রথমে কবরস্থ করা হয়। পরে তার হাড়-গোড়গুলো মাটি থেকে তুলে আবার চিতায় পোড়ানো হয়। অল্পবয়সী কোনো শিশু বিশেষত যাদের দাঁত ওঠে নি, মারা গেলে তাদেরকে খাঁচায় অথবা দোলনায় বেঁধে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গাছের আগায় বেঁধে দেয়া হয়। এটি ত্রিপুরারা কেন করে সে উত্তর জানা যায় নি। অনেক সময় কখনও কখনও মূর্ছাহত শিশুকে মৃত ভেবে এভাবে বেঁধে আসার ফলে পরবর্তী সময়ে কাছে-পিছের লোকজন তাকে পেয়ে বাঁচিয়েছে, এমন নজিরও আছে বলে শোনা যায়। ত্রিপুরারা হিন্দুধর্মাবলম্বী। সচরাচর তারা হিন্দুরীতি অনুযায়ী ১৩ দিন পরে মৃতের নামে শ্রাদ্ধ করে এবং গ্রামের লোকজনদেরকে খানা খাওয়ায়। ঐ দিন মৃতের

আত্মীয়-স্বজন নদীতীরে গিয়ে পূর্বে রক্ষিত চালের গুঁড়ার উপর বিবিধ চিহ্ন খোঁজে। যদি সেখানে শিশুর পদচিহ্ন থাকে তবে মৃত ব্যক্তি পুনরায় মনুষ্যকুলে জন্ম নেবে বলে তারা ধরে নেয়। সেখানে বাম হাতে মৃতের জন্য ভাত তরকারি রেখে আসা হয়। অতঃপর কোনো প্রাণী অথবা কীট-পতঙ্গ যদি তা খায়, তবে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সন্তোষজনক বলে ধরে নেয়া হয়। সবশেষে মৃতের জন্য ১৩ দিন ধরে অশুচি-ব্রত পালনকারী ব্যক্তি (বাড়ির কর্তাব্যক্তি) 'খুমপালা' নামক এক জাতীয় জংলী ফুলগাছের একটি পাতা দু'হাতে ছিঁড়ে নিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে বলে, "আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমাকে শেষ খানা এবং তোমার জন্য দানদক্ষিণা করে দিয়েছি। তুমি আর আমার উপর কোনো দাবি করার জন্য আসবে না। আজ থেকে এই 'খুমপালা' পাতাটি যেমন দু'টুকরা করে পৃথক করে ফেললাম, সেভাবে আমিও তোমার সঙ্গে পৃথক হলাম।" এই কথাগুলো বলে সে পাতাগুলো পিছন দিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে।

এরপর অনেকে মৃতের জন্য সদ্‌গতি কামনা করে কোনো রাস্তা তৈরি করে দেয় অথবা অন্য কোনো জনহিতকর কাজ করে দেয়। এই পুণ্যফল মৃতব্যক্তির আত্মা পাবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এই দুইটি পার্বত্য জেলার একটি উপজাতি হলো তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি। পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন তাঁর লিখিত The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে চাকমাদের একটি শাখা (sub tribe) হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তবে বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারগুলোর যে হিসাব প্রদান করা হয়েছে তা থেকে ঐ সময় তাদের জনসংখ্যা ১৮,৪৪০ জন বলে জানা যায়।

বসতিস্থান

তঞ্চঙ্গ্যারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি, রইস্যাবিল, বেতবুনিয়া, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাজস্থলী, রাইংখ্যং, ঠেগা ইত্যাদি স্থানে এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, বালাঘাটা, সুয়ালক, রোয়াংছড়ি, নোয়াপতং, কুক্ষ্যাং, পাইন্দু, চৈক্ষং, রেমাক্রী, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি ইত্যাদি স্থানে বাস করে। এ সকল স্থানে তঞ্চঙ্গ্যারা কবে থেকে বসবাস করছে সে সম্পর্কে অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো তাদের ক্ষেত্রেও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। ক্যাপ্টেন লুইনের লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে, ১৮১৯ সালের দিকে ৪০০০ হাজারের মত তঞ্চঙ্গ্যা এতদঞ্চলে এসেছিল। ঐ সময় চাকমা রাজা ধরমবক্স খান (১৮১২-৩২ খ্রি:) জনৈক ফাঙ্গুকে তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রধান হিসেবে স্বীকার না করায় তাদের অনেকে তাঁর সাথে আরাকানে ফিরে যায়। এ বিষয়ে যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাঁর লিখিত "তঞ্চঙ্গ্যা

উপজাতি" (১৯৮৫ ইং) গ্রন্থে লিখেছেন—"একদা ধন্যা গছা ও লাপোস্যা গছা লোকদের মধ্যে উয়াপে নামে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের বহুলোক হতাহত হন এবং উভয়পক্ষই রাজা ধরম বকশ খাঁর দরবারে বিচারের সম্মুখীন হ।। ইতোমধ্যে ধন্যা গছার লোকেরা কৌশলে রাজাকে খুশি করার জন্য চাঁদা উঠিয়ে চট্টগ্রাম শহরে একটা সুদৃশ্য পাকা গৃহ নির্মাণ করে দেন। যথাকালে বিচার হয় এবং বিচারে লাপোস্যা গছার পরাজয় হয়। অতঃপর রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চল ত্যাগ করে আবার আরাকানে চলে যায়।"

দল ও গোত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। এ সকল দলগুলোকে 'গছা' (গসা) বলা হয়। কয়েকটি বংশ মিলে এক একটি দল গঠিত। যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক 'তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি' গ্রন্থে তাদের ছয়টি বিশেষ দল ও সেগুলোর অন্তর্গত নিম্নলিখিত বংশগুলোর নাম নিম্নরূপে পাওয়া যায় :

দল (গছা)		বংশ (গোষ্ঠী)
মো	:	তাশি, কবাল্যা, আগারা, খুশ্বা, দাল্যা, গুণ্যা ও কুরুগ।
কার্বোয়া	:	গছাল্যা, ফারাংশা, লাপোস্যা, আর্গোয়া, বকছাড়া, তাশি, বুঙ ও বলা।
ধন্যা	:	পশোর, পণ্ডিত, তাঞ্জাব, কালাতংজা, বন্ধ্যব, পিশো, রাঙেয়্যা, বলা ও বাঙ্গাল্যা।
মংলা	:	পালংশা, দারণ্যা, নাবানা, দেবা ও কালেয়া।
মেলং	:	আমেলা, আলু, তেমেলে ও পক্ত।
লাং	:	বেদব, শক্কা, লাম্বায়া, পায়া ও বলা।

জন্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি

প্রত্যেক সমাজে কারও জন্ম, বিবাহ কিংবা মৃত্যু হলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের

মাঝেও জন্ম, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি রয়েছে। নিম্নে সে বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল।

জন্ম

তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে শিশুর জন্মের সময় প্রসূতিকে সাহায্য করার জন্য গ্রামাঞ্চলে ধাত্রীকে ডাকা হয়। তারা ধাত্রীকে "অসা-মেলা" (অর্থাৎ ধাত্রী মহিলা) বলে। শিশুর জন্মের পর 'দলুক' নামক এক টুকরা ধারালো বাঁশের ফালি দিয়ে নবজাতকের নাভিটি ছিন্ন করে নাভিমূলের ৫/৬ ইঞ্চি উপরে তা বেঁধে দেওয়া হয়। অতঃপর গর্ভাশয়ের ফুল একটি হাঁড়িতে ঢুকিয়ে বাড়ির প্রাঙ্গণের এক কোণে পুঁতে ফেলা হয়। এরপর নবজাতককে ঈষৎ উষ্ণ জলে পরিষ্কার করানোর পর তাকে মায়ের পাশে শুকনো কাপড়ের উপর রাখা হয়। প্রসূতিকে আঁতুর ঘরে সন্তানসহ কয়েকদিন থাকতে হয়। ঐ সময় 'ঘিলাকসই' এর পানি দিয়ে শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রসূতিকে অশুচী বলে মনে করা হয়। এবং তখন তার নিজস্ব ব্যবহৃত জিনিসপত্র ছাড়া বাড়ির অন্য জিনিসগুলো ধরা বা স্পর্শ করা নিষেধ। একপ্রকার বড় আকারের পিঙ্গলরঙ বিশিষ্ট গোলাকৃতি বীচির নাম 'ঘিলা' এবং 'কসই' হলো এক প্রকার বন্য হলুদ জাতীয় উদ্ভিদ। একটি পাত্রে ঘিলা ও কসই-এর টুকরা এবং সোনা কিংবা রূপা রেখে ঐ জল দিয়ে পবিত্র হওয়াকে 'ঘিলাকসই পানি' দিয়ে পবিত্র হওয়া বলে। এই পবিত্র জল ছিটিয়ে দিবা ভাগে প্রসূতি, নবজাতক ও আঁতুরঘরকে বা গৃহকে পবিত্র করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে ধাত্রীকে আমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তাকে মোরগ বা মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ানো হয় এবং তার প্রাপ্য দেওয়া হয়। রীতি অনুযায়ী তাকে ভাতের থালায় এক টাকা দেওয়া হয় এবং সে তা নেয়। ঐ টাকাকে "নাই-কাবা-তাঙা" (নাড়ী কাটার জন্য টাকা) বলে। এভাবে নবজাতকের জন্মের পর বিভিন্ন কার্য ও অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

বিবাহ

তঞ্চঙ্গ্যারা বিবাহকে বলে 'সাঙা'। তাদের সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে। এদের মধ্যে 'মো' গছা বা দলের

লোকদের মধ্যে যে ধরনের আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। সে সম্পর্কে যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাঁর লিখিত 'তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা থেকে সংক্ষেপে একটি বর্ণনা দেওয়া গেল। কনে পছন্দ হলে রীতি অনুযায়ী বরের পিতা কিংবা অভিভাবককে কনের পিতা কিংবা অভিভাবকের নিকট তিনবার যেতে হয়। অতঃপর বিবাহের দিন ধার্য হলে নির্দিষ্ট দিনে বরকে সাজিয় কনের বাড়িতে নেওয়া হয়। ঐ সময় 'ফো-কালং' নামক একজাতীয় ঝুড়িতে করে কনের জন্য পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকারপত্রাদি নেওয়া হয়। বরযাত্রীরা বরসহ কনের বাড়ির প্রাঙ্গণে পৌছলে কনেকে তাদের বাড়ির একটি কক্ষে তার কোনো একজন বান্ধবীসহ একটি কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়। একে 'বৌ-লুগানা' (বউ লুকানো) বলে। অতঃপর কনের ভগ্নীপতি বা ঐ স্থানীয় কোনো একজন আত্মীয় এসে বরের মাথার উপরে শূন্যে একটি মুরগীর ডিম কয়েকবার ঘুরিয়ে ডিমটি বরের পিছনের দিকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার পর বরের হাত ধরে বরকে কনের কক্ষে নিয়ে বসিয়ে দেয়। একে 'জামাই তুলা' বলে। ঐ সময় কনের সাথে অবস্থানকারী তার বান্ধবী তার সামনের কাপড়টি তুলে কনেকে সবার সামনে প্রকাশ করে। সেখানে কনেকে তার জন্য আনা পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারপত্রাদি দ্বারা সাজানো হয় এবং তাকে বরের বাম পার্শ্বে বসিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় ছায়ল এবং ছায়লী হিসেবে কার্যরত ব্যক্তিরা বর ও কনে উভয়ের কোমরের চার পার্শ্বে একটা শ্বেত বস্ত্র খণ্ড দিয়ে তাদেরকে যুক্ত করার জন্য উপস্থিত লোকদের সম্মতি চেয়ে তিনবার বলে, —ও বুড়াবুড়ি, পাড়াল্যা গণ্যমান্য লোক, অমুক (বরের নাম) অমুকীর (কনের নাম) লাত্তং বানি দিত্ত্যে, তা-নে ফইগুই দিবার হুগুম আগেনে নাই? (কথাগুলোর অর্থ হলো—হে পাড়ার বুড়োবুড়ি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, অমুক (বরের নাম) অমুকীর (কনের নাম) বিবাহে জোড় বেঁধে দিচ্ছি। এতে আপনাদের সম্মতি আছে কি নেই? উপস্থিত লোকেরা "আগে" (আছে) বললে উপস্থিত ছায়লা বরকে তার বস অবস্থায় কোমরে ধরে সাতবার উপরে তুলে ধরে ও নামায় এবং ছায়লীও কনের কোমর ধরে তাকে বসা অবস্থায় সাতবার উপরে তুলে ধরে ও নামায়

একে "নাচে দেনা" (নাচিয়ে দেওয়া) বলে। তৎপরে বর ও কনের ডান করদ্বয় একত্র করে তার উপর মঙ্গল ঘটের জল ঢেলে দেওয়া হয়। এভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলে বর ও কনে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দেরকে প্রণাম করে তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তার মুখে একটি রৌপ্য মুদ্রা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এটিকে 'মুঅ-তাঙা' (মুখের টাকা) বলা হয়। তার দেহ স্নান করানোর পর তাকে নতুন শ্বেতবস্ত্র পরানো হয়। তার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা তার আত্মার সদগতি কামনা করে তার বুকে টাকা পয়সা দান করে। এ জাতীয় টাকা পয়সাকে 'বুগ-তাঙা' (বুকের টাকা) বলে। যেদিন মরদেহ শ্মশানে দাহ করার জন্য নেওয়া হয় সেদিন তার উদ্দেশ্যে ভাত ও মুরগীর বাচ্চা রান্না করা হয়। তা থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ তার মুখে স্পর্শ করানো হয় এবং অবশিষ্টাংশ কলাপাতায় মুড়ে তার সাথে দেওয়া হয়। অতঃপর অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যথারীতি সম্পন্ন করার পর মৃতকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

তার আত্মার সদগতি কামনা করে বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গলসূত্র শ্রবণ করা হয় এবং তার আত্মার সদগতি কামনা করে বৌদ্ধভিক্ষুকে দান প্রদান করা হয়। মৃতলোকটি পুরুষ হলে পাঁচ স্তর লাকড়ি দিয়ে এবং স্ত্রীলোক হলে সাত স্তর লাকড়ি দিয়ে তার চিতা সাজানো হয়। মরদেহ যথারীতি দাহ করার জন্য চিতার উপর রাখা হয়। অতঃপর তার জ্যেষ্ঠপুত্র কিংবা রীতি অনুযায়ী কোনো আত্মীয় চিতাকে সবার প্রদক্ষিণ করার পর শবের মুখে অগ্নি স্থাপন করে। এরপর অন্যান্যরা চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। যে সকল ব্যক্তিরা শবদাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর নদীতে বা অন্য কোনো জলাশয়ে স্নান করে পবিত্র হয়। তারপর তারা বাড়ি ফিরে যায়।

শবদাহের পরদিন তার স্বগোত্রীয় কোনো আত্মীয় শ্মশানে গিয়ে তার অস্থির কিছু অংশ একটি নতুন হাঁড়িতে নিয়ে তার মুখটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় এবং যথারীতি জলে ভাসিয়ে দেয়। (যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, ১৯৮৫ দ্র:)

ম্রো

এখানকার উপজাতীয়দের মধ্যে ম্রোদের জীবন ও সংস্কৃতি প্রকৃতই আকর্ষণীয় বিষয়। বান্দরবান জেলায় চিমবুক পাহাড়ে গেলে যে কোনো পর্যটকের দৃষ্টি সহজেই তারা আকর্ষণ করে। বান্দরবান জেলায় থানচি, লামা ও নাক্ষ্যংছড়ীতে ম্রোদের বেশ্ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্রোদের জনসংখ্যা হলো প্রায় ১১,১৯৬ জন। ম্রোরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত বার্মার আকিয়াব জেলায়ও বসবাস করে।

কোনো কোনো লেখক তাদের নাম 'ম্রু' হিসেবেও লেখেন। তবে তারা নিজেদের 'মারুসা' বলে। এর অর্থ মানুষ। আরাকানের আদিবাসীদের মধ্যে ম্রোদের নামও উল্লেখযোগ্য। আরাকানিদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অতীতে আরাকানের ওয়াথালী (বৈশালী) নগরে যখন আরাকানের রাজধানী ছিল, তখন দুজন ম্রো-রাজা দশম শতাব্দীতে তাদের পূর্ববর্তী চন্দ্রবংশীয় রাজাদেরকে উৎখাত করে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করে আরাকানে রাজত্ব করেছিলেন। Col. Phayre তাঁর History of Burma (1883) গ্রন্থে এ দুজন রাজার নাম লিখেছেন, যথাক্রমে—১. A-mya-thu (৯৫৭ খ্রি:) এবং ২. Pai-phyu (৯৬৪ খ্রি:)।

অতীতে আরাকান কখনো কখনো ধিন্যাওয়াতী (ধন্যবতী) নামেও পরিচিত হতো। এই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আরাকানে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। একবার একজন ম্রো সর্দার অতীতে কোলাডাইন নদীর

উজানে শিকারে গিয়ে বনে একটি মানবশিশু পান। একটি বন্য হরিণী শিশুটিকে ঐ স্থানে নিয়ে এসেছিল। ম্রো–সর্দার শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে লালন–পালন করেন এবং তার নামকরণ করা হয় মারায়ো। তিনি বড় হয়ে ম্রো–সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করেন ও আরাকানের রাজা হন। অতঃপর তিনি আরাকানের একজন ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজকন্যাকেও বিয়ে করেন এবং একটি নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন ধিন্যাওয়াতী।

ম্রোরা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে খুব একটা বেশি দিনের কথা নয়। বিগত শতাব্দীর দিকে খুমি উপজাতীয়দের চাপে পড়ে তারা আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পড়ে। আরাকানের কোলাডাইন নদীর তীরে খুমিদের সাথে ম্রোদের এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। উক্ত সংঘর্ষে ম্রোরা পরাজিত হয়েছিল।

ম্রোরা বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী, তবে তাদের কিছু কিছু লোক খ্রিস্টান মিশনারিদের বদৌলতে সাম্প্রতিককালে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে এখনো বহু প্রকার জড় উপাসনা দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস থুরাই নামে একজন বিশ্বনিয়ন্তা রয়েছেন। তিনি নাকি একবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে একটি গরুকে দিয়ে ম্রোদের কাছে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠান। গরুটি ঐ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত হয়ে ঐটি খেয়ে ফেলে এবং থুরাই ম্রোদের কাছে যে সমস্ত উপদেশ বাণী পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কেও মিথ্যা কথা বলে। এর ফলে ম্রোদের খুব ক্ষতি হয়। তাই তারা আজও পূজা অনুষ্ঠানে গরুকে হত্যা করার পর শাস্তিস্বরূপ গরুর জিহ্বাটি কেটে নেয়।

ম্রোদের মধ্যে বহু ধরনের সংস্কার রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো মেয়েদের মতো তাদের ছেলেরাও মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং মাথার উপর চুলগুলো খোপার আকারে বাঁধে। তারা ছেলে এবং মেয়ে সকলেই দাঁতে রঙ লাগায়। মেয়েরা ঘন নীল রঙের একজাতীয় স্কার্ট নিম্নাঙ্গে পরে ; এর নাম ওয়ানক্লাই। নাচের আসরে তারা ঠোঁটে, গালে এবং কপালে রাঙা রঙ লাগায়। মেয়েরা কানে ও খোঁপায় ফুল, কোমরে রূপার বিছা এবং গলায় নানা ধরনের পুঁতির মালা ব্যবহার করে। সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয় ম্রো উপজাতি তাদের নাচে বিবাহিত মেয়েদেরকে অংশ নিতে দেয় না। নাচে সচরাচর যুবক এবং যুবতীরাই অংশ গ্রহণ করে।

ম্রোদের বাঁশীর নাম 'প্লুং'। লাউ জাতীয় এক ধরনের জংলী ফলের শুকনো খোলে ৪/৫টি বাঁশের নল মোম দিয়ে পুঁতে প্লুংতৈরি করা হয়। ঐ সমস্ত ছোট ছোট বাঁশের নলগুলোর মাথার ঢাকনা হিসেবে ছোট ছোট বাঁশের টুকরো থাকে। নাচের আসরে পরিবেশকে আনন্দমুখর করার জন্য 'মং' বা 'গং' নামক এক ধরনের কাসার ঘন্টাও বাজানো হয়। প্রায় সমসংখ্যক যুবক-যুবতী কোনো একটি কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্ত রচনা করে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। তখন তাদেরকে দূর থেকে অপরূপ মনে হয়।

গোহত্যা অনুষ্ঠান

ম্রোরা জুমের ফসল ঘরে তোলার পরে সচরাচর গোহত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্যসহ প্রচুর খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি গরুকে বধের জন্য নৃত্যের আসরে বেঁধে রাখা হয়। যে পরিবার গোহত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাঁরাই ঐ গরুটি পূজার জন্য দিয়ে থাকেন। পূজায় "আইডাম" নামক একজাতীয় হরিদ্রাভ ফল ছোট ছোট করে কেটে কলাপাতার উপর রাখা হয় এবং সেই সাথে একপাশে চালও রাখা হয়। এছাড়া পূজায় 'কাঁচা মদ'ও একটি লাউজাতীয় ফলের শুকনো খোলে রাখা হয়। একটি পাত্রে মদের নিমিত্ত পূর্বাহ্নে পঁচানো ভাতের সাথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মেশানো হয়। তারপরে সেগুলোর উপর ধান

বিছিয়ে তাতে কলাপাতা দিয়ে ঢাকা হয়। এরপর কলাপাতার মধ্য দিয়ে ছিদ্র করে একটি বাঁশের নল ঐগুলোতে পুঁতে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য সেই নলের তলা ভাতের স্তর পর্যন্ত প্রবেশ করে। নলের খোলা অংশটির মুখ উপর দিকে খোলা থাকে। তা দিয়ে চুষে মদ পানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ঐ সমস্ত আয়োজনের পর তাতে জল ঢালা হয়। ঐ জলে কিছুক্ষণ পর মাদকতা আসে; ওরই নাম "কাঁচা মদ"।

পূজার শুরুতেই পুরোহিত ঐ লাউজাতীয় ফলের খোলটিতে পরপর ছয়বার ফুঁ দেয় এবং তৎসঙ্গে প্রতিটি ফুঁ-এর পরে পূর্বে-বর্ণিত নলটি চুষে কাঁচা মদ মুখে নেয় আর ফুঁ দিয়ে ঐগুলো ছিটাতে থাকে। বলা বাহুল্য তৎসঙ্গে পুরোহিত মন্ত্র পাঠও করতে থাকে। এই সময় পরিবারের সদস্যেরা একজন একজন করে কলাপাতায় রক্ষিত চাউল ও 'আইডাম" ফলের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে পরপর পূজাস্থানে ছয়বার ছিটিয়ে বলে "এই বাড়ির আপদ-বিপদ দূর হয়ে যাক।" প্রত্যেক সদস্যের ঐ অনুষ্ঠান সম্পাদনকালে পুরোহিত লাউজাতীয় ফলের খোলটিতে ফুঁ দিয়ে ছয়বার মঙ্গলধ্বনি করে আর মুখে মদ নিয়ে ফুঁ দিয়ে ছিটায়। এরপর চলে তরুণ-তরুণীদের নাচগান। নাচগানের পরদিন গরুটিকে যথারীতি সামনের ডান পায়ের বগলের নিচে দিয়ে বর্শা মেরে বধ করা হয়। এরপর গরুটির জিহ্বা কেটে এটিকে একটি বাঁশের টুকরায় গেঁথে পূজা-স্থানের গাছের খুঁটিটির উপর বেঁধে দেয়া হয়। তারপর চলে খানাপিনা।

গোত্র এবং বিবাহ

ম্রোদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তারা বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। এগুলো হলো ঙারুয়া, ঙারিংচাহ্, তাং, দেং, খউ, তাম-তু-চাহ্, কান্‌বক, প্রেনজু, নাইচাহ্, ইয়ম্‌রে ইত্যাদি। উল্লিখিত গোত্রগুলোর মধ্যে ঙারুয়া গোত্র সমাজে সব দিক দিয়েই প্রভাবশালী। আবার 'ঙারুয়া' গোত্রের ৪টি উপগোত্র রয়েছে। ঙারুয়াদের ৪টি উপগোত্রের নাম যথাক্রমে খাটপো, চিম্‌লুং, জংনাউ এবং চাউলা। উক্ত উপগোত্রগুলো নামে উপগোত্র হলেও এগুলো কার্যত এক

একটি গোত্রের মতো। একারণে ঙারুয়াকে এককভাবে একটি গোত্র না বলে একটি দল অথবা ৪টি গোত্রের সমষ্টি বলা যেতে পারে ; অনেকটা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা–সমাজের 'গঝা' গুলোর মতো। উল্লেখ্য যে, কয়েকটি 'গুথি (গোষ্ঠী) মিলে চাকমাদের একটি 'গঝা' গঠিত হয়। ম্রোদের সমাজজীবনে গোত্রগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন : ১. একই গোত্রের দুজন ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন 'দেং' গোত্রের ছেলে একজন 'দেং' গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। তাকে বিয়ে করতে হবে অন্য কোনো গোত্র থেকে। ২. আবার যুদ্ধ–বিগ্রহ বা অন্য কোনো সময় কোনো না কোনো কারণে যদি দুইটি গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্ব (অনেকটা প্রাচীন গ্রিকদের মতো) গঠিত হয়, তবে উক্ত দু'টি গোত্রের ছেলেমেয়েরা একে অন্যের কাছ থেকে বিয়ে করতে পারে না ; যেমন, ঙারুয়াদের "খাটপো" বংশের সাথে "তাম–তু–চাহ্" এবং ইয়ম্'রে গোত্রের ভাই–ভাই সম্পর্ক রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ–সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কিন্তু তারা পরস্পর একে অপরকে আপদে–বিপদে সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। ৩. ম্রোদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী একটি গোত্রের ছেলেরা নির্দিষ্ট অন্য কয়েকটি গোত্রের মেয়েদেরকে শুধু বিয়ে করতে পারে। আবার কোনো গোত্রের ছেলেরা যে সমস্ত গোত্রের মেয়েদেরকে বিয়ে করে, ঐ একই গোত্রের মেয়েদের ঐ সব গোত্রের ছেলেদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ "ঙারুয়াদের" "খাটপো" বংশের ছেলেরা খউ, কান্‌বোক, নাইচাহ্ গোত্রের মেয়েদেরকে চিরদিন বিয়ে করে আসছে এবং আগামীতে তাই করবে। আবার "খাটপো" বংশের মেয়েরা ঐ সমস্ত গোত্রের ছেলেদেরকে বিয়ে করতে পারবে না। ৪. প্রত্যেক গোত্রের মেয়েদেরকে নির্দিষ্ট কয়েকটি গোত্রের ছেলেরা বিয়ে করে এবং চিরদিন তাই করবে। এই হলো বিয়ের ব্যাপারে তাদের রীতিনীতি। এস্থলে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, "খাটপো" বংশের মেয়েদেরকে দেং এবং প্রেনজু গোত্রের ছেলেরা বিয়ে করে এবং আগামীতেও চিরদিন রীতি অনুসারে তাই করবে। নিম্নে খাটপোদের সাথে অন্যান্য গোত্রগুলো বিয়ে ঘটিত সম্পর্কের একটি তালিকা তুলে ধরা গেলো।

আন্তঃগুরুয়া বিবাহ সম্পর্ক

১.	খাটপো	ছেলে×খাটপো মেয়ে—	বিয়ে হয় না। (যেহেতু একই বংশ)
২.	খাটপো	মেয়ে+সিমলুং ছেলে	বিয়ে হয়।
৩.	খাটপো	ছেলে+জংনাউ মেয়ে	বিয়ে হয়।
৪.	খাটপো	ছেলে×চাউলা মেয়ে	বিয়ে হয় না। (যেহেতু ভাই-ভাই সম্পর্ক)

গুরুয়াদের সাথে অন্যান্যদের বর্হিগোত্র সম্পর্ক

৫.	খাটপো	ছেলে+তাং (১ম দলের) মেয়ে	বিয়ে হয়।
৬.	খাটপো	ছেলে×তাং (২য় দলের) মেয়ে	বিয়ে হয় না। (যেহেতু ভাই-ভাই সম্পর্ক)
৭.	খাটপো	ছেলে+তাং(৩য় দলের) মেয়ে	বিয়ে হয়।

(উল্লেখ্য তাং গোত্রের তিনটি উপদল রয়েছে)।

৮.	খাটপো	মেয়ে+দেং ছেলে	বিয়ে হয়।
৯.	খাটপো	ছেলে+খউ মেয়ে	বিয়ে হয়।
১০.	খাটপো	ছেলে×তাম্-তু-চাহ্ মেয়ে	বিয়ে হয় না। (যেহেতু ভাই-ভাই সম্পর্ক)
১১.	খাটপো	ছেলে+কান্বক মেয়ে	বিয়ে হয়।
১২.	খাটপো	মেয়ে+প্রেনজু ছেলে	বিয়ে হয়।
১৩.	খাটপো	ছেলে+নাইচাহ মেয়ে	বিয়ে হয়।
১৪.	খাটপো	ছেলে×ইয়ম্রে মেয়ে	বিয়ে হয় না (যেহেতু ভাই-ভাই সম্পর্ক)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ম্রোদের বংশ পরিচয় পিতৃধারায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে কোনো বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করলে তার পূর্বতন স্বামীর ঔরসজাত ছেলে-মেয়েরা

তার সাথে থাকলে তারা তার দ্বিতীয় স্বামীর গোত্র পরিচয় ধারণ করতে পারে।

বিবাহ

প্রেম : ম্রো সমাজে ছেলেমেয়েরা বড় হলে বাপের বাড়ির চেয়ে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে বাড়িতেই অধিক সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। তাদের সমাজে এ ব্যাপারে যুবতী মেয়েদের স্বাধীনতা রয়েছে। প্রায় রাত্রে তারা কয়েকজন মিলে দলবদ্ধ হয়ে ঘুমাতে যায়।

শীতের রাত্রে ম্রো যুবতীরা মাচাঘরের উপরে চুলায় আগুন জ্বেলে আগুন পোহায় আর গল্প গুজবে মেতে ওঠে। ঐ সময় জ্যোৎস্না রাত হলে যুবকেরা প্রেমিকার খোঁজে বেরয়। তারা যুবতীদের সাথে যোগ দিয়ে মনের ভাব বিনিময় করে। প্রায় আসরে গল্পগুজব গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। এভাবে মেলামেশা হতে হতে তারা একদিন একে অপরকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়।

কনের শ্বশুরবাড়ি গমন : বিয়ের দিনক্ষণ প্রায় ক্ষেত্রে প্রেমিক-প্রেমিকারা নিজেরাই ঠিক করে। প্রেমিক তার সাধ্যানুসারে বিয়ের আগেভাগেই প্রেমিকাকে তার আবদার অনুযায়ী বিভিন্ন অলঙ্কারাদি উপহার দেয়। সচরাচর কনে রাত্রি বেলায় তার বান্ধবীদের নিয়ে বধূ বেশে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। তার এ যাওয়া অনেকটা প্রেমিকের বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার মতো। যদিও তার এ পালিয়ে যাওয়ার খবর তার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব ও পাড়াপড়শীরা আগে থেকেই জেনে থাকে। উল্লেখ্য আনুষ্ঠানিক বিয়েতে খরচ অনেক। তাই ম্রো-কনেরা এভাবে বরের বাড়িতে পালিয়ে যায়।

বিবাহের আয়োজন

পরদিন ভোরে বরের বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। মাচাঘরে ওঠার সিঁড়ির পাশে বাঁশ পুঁতে তাতে বেত দিয়ে ফুল তৈরি করে সাজানো হয়। একটি শূকর বিয়ের উদ্দেশ্যে মারা হয়। রীতি অনুযায়ী শূকরটিকে সামনের ডান পায়ের বগলের নিচ দিয়ে বর্শা মেরে হত্যা করা হয়।

এরপর শূকরটির ডান কান কেটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টুকরো করে একগুচ্ছ সুতা (নিজেদের তৈরি) দিয়ে বাঁধা হয়। প্রত্যেকটি গুচ্ছে সাতগাছি সুতা থাকে। এগুলো পরে বর, কনে ও তাদের পরিবারবর্গের হাতে বেঁধে দেয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি চালুনিতে এক বোতল মদ, একটি দা ও দুটি বাটি থাকে। ঐ দুটি বাটির একটিতে ভিজা চালের গুড়া ও অন্যটিতে কাঁচা হলুদ বাটা থাকে। তৃতীয়ত আর একটি পাত্রে শূকরের কানের চিক্কণ টুকরাগুলো সুতাবাঁধা অবস্থায় আনা হয়। উল্লিখিত ভিজে চালের গুঁড়ার নাম 'বেশম'। একটি গ্লাসে কিছু পরিমাণ মদও সেখানে থাকে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান

বিয়ের সময় বর ও কনে পাশাপাশি বসে। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিয়ের মন্ত্র পাঠ করতে করতে একটি সদ্য সংগৃহীত লাউ জাতীয় ফলের খোলে মুখ ঢুকিয়ে ৬ বার ফুঁ দিয়ে মঙ্গলধ্বনি করে। তারপর কনের ডান হাতের মনিবন্ধে শূকরের একটি কানের টুকরাসহ একগাছি সুতা বেঁধে দেয়। কনের হাতে বিয়ের ঐ সুতা বাঁধার পর রীতি অনুযায়ী সুতার বাড়তি অংশটি দা একটিকে উল্টোভাবে ধরে নিচ থেকে উপর দিকে ঘষে সুতাটি কাটতে হয়। কনের পরে একই নিয়মে বরের ডান হাতেও বিয়ের সুতা বাঁধা হয়। পরে বরের পরিবারের হাতেও ঐ সুতা বাঁধা হয় ; নিয়ম অনুযায়ী সর্বাগ্রে পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ এবং সর্বশেষে বয়োজ্যেষ্ঠরা হাতে সুতা বাঁধে। সচরাচর বরের পিতামাতার হাতেই সর্বশেষে ঐ সুতা বাঁধা হয়।

এরপর কনে ডান হাতের তর্জনী (আঙ্গুলটি) দিয়ে চালের গুঁড়া স্পর্শ করে প্রথমে কপালে, পরে বুকে, তারপর পিঠে স্পর্শ করে। একইভাবে কনে হলুদের গুঁড়া দিয়েও ঐ সমস্ত স্থান স্পর্শ করে তৎপরে বরও ঐ কার্যাদি করে থাকে। এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর তারা সমাজে স্বামী-স্ত্রী রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

আনন্দ-ফুর্তি

এরপর আনন্দ-ফুর্তির পালা। একটি পাত্রে কনের বান্ধবীদের জন্য নিয়ে আসা হয় 'কাঁচা মদ'। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভাতে মিশিয়ে জল ঢেলে জ্বাল

ছাড়া অবস্থায় যে মদ তৈরি করা হয় তাকে 'কাঁচা মদ' বলে। ঐ সময় যুবক-যুবতীদের মধ্যে হৈ-হুল্লড় পড়ে যায়। যুবতীরা কে কি পরিমাণ মদ খেতে পারে তা খতিয়ে দেখার জন্য যুবকেরা মদের পাত্রে দাগকাটা বেত ঢুকিয়ে দেয়। এ সময়ে রীতি অনুযায়ী বরের আত্মীয়স্বজন কনের প্রধান বান্ধবীদের হাতে প্রথমে দশ টাকাসহ ঐ পাত্রটি তুলে দেয়। সে বেচারী প্রথমে মদের পাত্রে চুমুক দেয়। তারপর একে একে অন্যান্য যুবতীরা যুবকদের অনেক অনুরোধ অনেক অনুনয়ের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে একে একে মদের পাত্রে চুমুক দেয়। তবে তারা খুব বেশি মদ কখনও পান করে না, এ শুধু আনন্দের জন্য করে থাকে। এরপর শুরু হয় খানাপিনার পালা।

পণ

বিয়ের পর কনে বাপের বাড়িতে গেলে কনের পিতামাতা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই প্রথম বিয়ের ব্যাপারটা জানার ভান করে বরের কাছে পণ হিসেবে টাকাসহ, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি দাবি করেন। দাবির মধ্যে ব্রিটিশ আমলে কনের দেহের মূল্য বাবদ রৌপ্য টাকায় ১০০.০০, মায়ের দুধের দাম বাবদ ১০.০০ সহ বেশ কিছু সংখ্যক (সচরাচর ২টি) তলোয়ার, ১২টি দা ও ২৪টির মতো ছুরি থাকে। এ ছাড়া আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-পড়শীদেরকে ভোজে আপ্যায়িত করার ইচ্ছা থাকলে তিনি (শ্বশুর) জামাইয়ের কাছে ১০০টি বা তার চেয়ে কম সংখ্যক মোরগ-মুরগীও দাবি করতে পারেন। শ্বশুরের ইচ্ছা অনুযায়ী ঐগুলো জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাকে দিতে হয়। ঐ সমস্ত মোরগ-মুরগীর মধ্যে কমপক্ষে একটি মোরগ থাকতে হবে। এ ছাড়া ঐগুলো অবশ্যই জোড় সংখ্যক হওয়া চাই। রীতি অনুযায়ী বরপক্ষকে ঐগুলো কেটে নখ, ঠোঁটের আগা, আঁতড়ি, পালক ইত্যাদি উত্তমরূপে ফেলে দিয়ে কনের পিতামাতার হাতে গছিয়ে দিতে হয়। এরপরে কনেপক্ষ বরপক্ষের আত্মীয়স্বজনদের হাতে পরিমাণ মতো লবণ, মরিচ, মশলা দিলে বরের মা-ভগ্নী বা অন্য কোনো আত্মীয়কে ঐগুলো রেঁধে দিতে হয়। এটিই তাদের রীতি। একইভাবে কনের মা, ভগ্নী বা অন্য কোনো আত্মীয়াকে বরের বাড়িতে শূকরের মাংস নিয়ে গিয়ে ঐভাবে রাঁধতে হয়।

কনের পিতার আরও কিছু অধিকারের কথা আলোচনা করা যাক। কোনো না কোনো কারণে যদি বরের দেয়া মোরগের ঝুঁটি, ডানা বা নখ এবং মুরগীগুলোর কোনোটির আঙ্গুল বা অন্য কোনো অংশ কাটা না থাকে তবে কনের পিতা তাকেও জরিমানা করতে পারেন। জরিমানার মধ্যে বরকে এক বোতল মদ ও একটি মোরগ বা মুরগী দিয়ে হয়তো শ্বশুরের কাছে মাফ চাইতে হয়। এরপর শ্বশুরের পালা। শুভদিন দেখে একদিন শ্বশুর এবং শাশুড়ী জামাইয়ের জন্য একখান সাদা কাপড় (পাগড়ি হিসেবে), একটি শূকর (ভোজ দেওয়ার জন্য) এবং একটি বাঁশের চোংগায় শূকরের তৈল দিয়ে রান্না করা বিনি চাউলের ভাত নিয়ে যান। রীতি অনুযায়ী বরের পিতামাতা তাদেরকে লবণ, মরিচ, তৈল, মশলা ইত্যাদি সরবরাহ করেন। কনের মা অথবা বোন সম্পর্কীয় কেউ একজন এরপর ঐগুলো রাঁধেন। তারপর খাওয়াদাওয়া এবং গল্পগুজব চলে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বরপক্ষ যদি কোনো উৎসব অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিনে কনের বাড়িতে যায় চিরদিনই তাদেরকে সাথে জোড় সংখ্যক মোরগ-মুরগী নিয়ে যেতে হয় এবং অপরপক্ষে কনের পিতামাতা বা ভাইবোনদেরকেও বরের বাড়িতে শূকরের মাংস নিয়ে যেতে হয়।

অবৈধ সম্পর্ক

কোনো যুবক-যুবতী যদি সবার অজ্ঞাতে বনে পালিয়ে যায় তবে তাদেরকে সবাই মিলে বন থেকে পাকড়াও করে আনে, তারপর গোত্রগুলোর নিয়মানুসারে বিবাহের সম্ভাবনা থাকলে বিয়ে দিয়ে দেয় অথবা কিছু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়। ম্রোদের সমাজে গোত্রের দিক থেকে বিবাহটা অসম্পর্কীয় হলে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে দেয়া হয় না। কোনো যুবতী যদি বিয়ের পূর্বে গর্ভবতী হয়ে পড়ে তবে তাকে এবং তার প্রেমিককে দু'টি শূকর জরিমানা করা হয়।

যে গৃহস্থের বাড়িতে যুবতী গর্ভবতী হয়, তাকে একটি শূকর দেয়া হয় এবং অন্যটি সবাই মিলে বিশেষ একটি ঘরে বা বাইরে রান্না করে একসাথে খায়। এই শূকরের মাংস প্রজননহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধরাই শুধু খেতে পারে। ম্রোদের বিশ্বাস ঐ গৃহস্থকে একটি শূকর না দিলে দিন দিন তার সম্পত্তি রসাতলে

যাবে। পূর্বে ঐ দুজন যুবক-যুবতীকে অসামাজিক কাজের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে শূকরের রক্ত ভাগ করে দিয়ে আসতে হতো। বর্তমানে অবশ্য এ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে আরও একটি তথ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, তা হলো— ম্রোদের একাধিক বিয়ে অথবা বিধবাদের পুনঃবিয়েতে কোনো বাধা নেই।

বিবিধ

বর্তমানে ম্রোদের মধ্যে খুবই দেরিতে হলেও কিছু কিছু লেখাপড়া শুরু হয়েছে। আশা করা যায় আগামীতে তারা ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি করবে। তবে অন্যান্য সংস্কৃতির চাপে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি শ্লথতার কারণে তাদের সামাজিক প্রগতি যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সবাই দৃষ্টি রাখলে তারা উপকৃত হবে বলে বিশ্বাস। সম্প্রতি বান্দরবান চিম্বুক পাহাড়ে 'ম্রো কমপ্লেক্স' নামক এক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বম

বম উপজাতীয় লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলার রুমা থানাতে বসবাস করে। এককালে তারা জড় উপাসক ছিল। বর্তমানে তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এর ফলে তাদের সমাজ-জীবন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তারলাভ করেছে। রুমাতে গেলে তাদের যুবক-যুবতীদেরকে প্রায়ই গিটার বাজিয়ে গান গাইতে দেখা যায়। তখন তাদেরকে খুবই প্রাণবন্ত মনে হয়।

অতীতে বমরা আরাকান অঞ্চলে বসবাস করতো। আরাকানিরা তাদেরকে 'লাংগি' বা 'লাংখে' বলে ডাকে। তারা আরাকানে থাকাকালে ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্লেংক্রেইং নামক জনৈক খুমি সর্দারের গ্রাম আক্রমণ করে বেশ কিছু লোককে হত্যা করে এবং অনেককে তাদের গ্রামে ধরে নিয়ে যায়। তাদের এই অভিযানের নেতৃত্ব লিয়ানকুং নামক ২৩/২৪ বছরের একজন যুবনেতা দিয়েছিলেন। এই ঘটনার ফলে তাদেরকে ধরার জন্য আরাকানস্থ ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ তাদের লোক্যাল ব্যাটালিয়ানকে বমদের বিরুদ্ধে পাঠায়। তখন লিয়ানকুং তার লোকদের নিয়ে বান্দরবানের দিকে পালিয়ে আসেন এবং তিনি তৎকালীন বোমাং রাজার কাছে রুমা এলাকায় বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংরেজদের চাপে পড়ে খুমিবন্দীদেরকে আরাকানে ফেরত পাঠান।

ঐ ঘটনার পর থেকে বমরা স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলে থেকে গেছে। বর্তমানে তাদের লোকসংখ্যাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্টে বমদের পরিবারগুলোর যে সংখ্যা দেয়া হয়, তা থেকে তাদের সংখ্যা হলো প্রায় ৬,০৪৯ জন।

পূর্বে অনেকে তাদের নামের বানান 'বোম' হিসেবেও লিখেছেন 'বোম' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'বোমজাও' নামক একটি শব্দ থেকে। লালনাগ বোম ১৯৮১ সালে রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরির ম্যাগাজিন অঙ্কুর, ১ম সংখ্যায় 'উপজাতি পরিচিতি : বোম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখেছেন যে, 'পাংহয়' ও 'শুনথ্লা' নামক দুটি জনগোষ্ঠীর মিলনে 'বোমজাও' শব্দটি গঠিত হয়েছে ; যার অর্থ হলো 'সংযুক্ত-জাতি'। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে 'বোম' শব্দটির পরিবর্তে 'বম' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি আরও লিখেছেন যে, 'অতীতে তারা নিজেদেরকে 'লাই' বা 'লাইমি' বলে পরিচয় দিত, এই শব্দগুলোর অর্থ হলো মানুষ। সম্ভবত এককালে তারা চীনদেশের চীনলিং পর্বতমালায় বাস করতো। এই চীনলিং শব্দের অর্থ অসংখ্য পাথুরিয়া পর্বত। ঐ চীনলিং পর্বতমালা থেকে তারা বার্মার চীনদুইন ও ইরাওয়াদী নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় কোনো এক সময় চলে এসেছিল বলে তাঁর বিশ্বাস।

বমদের পাংহয় দলের মিলাই বংশীয় লোকেরা অনেক আগে থেকে লোহা ও পিতলের ব্যবহার জানতো। তারা এইসব ধাতু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতো ও যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতো। তারা দাও-কে 'লাইনাম', বর্শা-কে 'লাইফেই', এবং তীরধনুক-কে 'চানতিয়াং বলে।

অতীতে এসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন তারা এত বেশি অনুভব করতো যে, তারা মৃতকে কবর দেয়ার সময় তার সাথে কবরে অস্ত্রশস্ত্রও দিত। মৃতব্যক্তি যদি কোনো প্রভাবশালী সর্দার হতেন তবে বমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তাঁর পার্শ্বস্থ গুহায় ৭ দিনের মত খাবার রেখে তাঁর দাস-দাসীদেরকেও জীবন্ত কবর দিত। বর্তমানে অবশ্য খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর তাদের সমাজে এসব প্রথা লোপ পেয়েছে।

অতীতে বমদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর লোকেরা 'মিথিখোয়া' বা মৃতের দেশে চলে যায় এবং সেখানে নতুনভাবে জীবনযাপন করে। ইহলোকে অর্জিত সকল ধনরত্ন, দাস-দাসী তারা পুনরায় সেখানে ফিরে পায়। অতীতে

তাদের অন্য উপজাতীয়দের আক্রমণ করে ধনরত্ন ও দাস-দাসী সংগ্রহ করার পিছনে এটিও একটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

মৃতের পথ-যাত্রাকে সুগম করার জন্য তারা মৃতকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানোর সময় ঊর্ধ্বাকাশে তীর বা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে সানু নামক এক শ্রেণীর অপদেবতাকে তাড়িয়ে দিত। তারা ফকির-সন্ন্যাসী জাতীয় লোকদেরকে খোয়াভাং বলতো এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বনের বাঘ খোয়াভাং-এর পালিত পশু। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, বাঘ কখনো মানুষের ক্ষতি করে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে এসব বিশ্বাস আজ আর নেই। এখন তারা শিক্ষা-দীক্ষায়ও আগের চেয়ে কিছুটা উন্নত হয়েছে। তারা রুমাতে প্রচুর পরিমাণে কমলা, আনারস, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি লাভজনক ও অর্থকরী ফসলের চাষ করে ; যেগুলোর বিক্রিলব্ধ অর্থ দিয়ে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণ করে।

লুসেই ও পাংখুয়া

এখানকার কুকি-চীন ভাষাভাষী দুর্ধর্ষ উপজাতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি হলো লুসেইরা। এখানে স্বল্পসংখ্যক লুসেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-পূর্বাংশে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক এলাকায় বাস করে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় : লুসাই ১,০৯৮ জন এবং পাংখুয়া ২,৪০৪ জন। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে লুসেইদের সাথে পাংখুয়াদের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। উভয় উপজাতিই লুসাইপাহাড় বা মিজোরামের দিক থেকে অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে এসেছে। পাংখুয়াদের বিশ্বাস অতীতে তারা লুসাই পাহাড়ের 'পাংখোয়া' নামক একটি গ্রামে বাস করতো। তাদের ভাষায় 'পাং' অর্থ শিমুলফুল এবং 'খোয়া' অর্থ গ্রাম। পাংখুয়ারা লুসেইদের ভাষাও কিছু কিছু বুঝতে পারে। অতীতে এই দুইটি উপজাতির পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখতো এবং মাথার পিছন দিকে চুলগুলো ঝুঁটির আকারে বাঁধতো। অপরপক্ষে বমদের ভাষা ও সংস্কৃতিও এই দুইটি দলের সাথে কিছুটা মেলে। কিন্তু তারা মাথার সামনের দিকে তাদের চুলের ঝুঁটি বাঁধতো। লুসেইদের মধ্যে কতগুলো লোকের বিশেষ জাতীয় পাগড়ি মাথায় ব্যবহার করার অধিকার ছিল। যে সমস্ত লোকেরা গ্রামবাসীদেরকে বহু সংখ্যক ভোজে আপ্যায়িত করতো তারা ঐ বিশেষ জাতীয় পাগড়ি (ডাইয়ার) ব্যবহারের অধিকারী ছিল। তাদেরকে 'থাংগোহুয়াহ্' উপাধি দেওয়া হতো এবং সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পরে তারা স্বর্গে যাবে। Col. J. Shakespear ১৯১২ সালে The Lushei Kuki Clans গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন যে, বীরত্ব, সততা

ও উন্নত শিষ্টাচারের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা যে সমস্ত ব্যক্তিকে ঐ জাতীয় উপাধিতে সম্মানিত করতেন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁরা প্রথম মদের (জু) পাত্র পান করার অধিকারী হতেন।

লুসেইদের মূল বাসভূমি হলো মিজোরাম বা লুসাই পাহাড়ে। ১৯৬১ সালে মিজোরামে তাদের জনসংখ্যা ছিল ২,১১,৮০৭ জন। সেখানে তারাই সংখ্যাপ্রধান উপজাতি। মিজোরামে লুসেইদের আগমনের পূর্বেও বেশ কয়েকটি উপজাতি ছিল যাদেরকে তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। এ সমস্ত উপজাতীয়দের মধ্যে ত্রিপুরার রাংখোল এবং মণিপুরের থাডো ও বোইতে ইত্যাদি উপজাতিগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য। ড. বি. বি. গোস্বামী The Mizo Unrest (1979) গ্রন্থে জনৈক McCall-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ১৭৮০ সালের দিকে লুসেইরা সাইলো-পরিবারের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিক থেকে এসে মিজোরামের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সর্দার লাল্‌লুলা (Lallula) সাইলো এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে অথবা তৎপূর্বে থাংউরা (Thang-ura) নামক একজন লুসেই সর্দার লুসেইদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর গ্রামের নাম ছিল ট্লাংকুয়া। তাঁর কাছ থেকে ৬ জন পরাক্রমশালী লুসেই সর্দারের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন : ১. রোকুম, ২. জাদেং, ৩. থাংলুয়া, ৪. পালিয়ান, ৫. রিভুং ও ৬. সাইলো।

এদের মধ্যে থাংলুয়া ও রিভুং তাদের লোকজন নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে চেঙ্গী থেকে কাসালং নদীর মধ্যবর্তী অংশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঢুকে পড়েন। উপরে উল্লিখিত লাল্‌লুলা সাইলোর বংশধরেরা দুর্ধর্ষ হাউলং জাতীয় লোকদেরকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নেতৃত্ব দেয়। যাদের আক্রমণে কাছড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অজস্র জনপদ ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়েছিল। আর যাদের সর্দার ভোনোলেল, সাংভুংগা ও সাংভুংগার বিরুদ্ধে ইংরেজরা ১৮৭১-৭২ সালে দু'জন জেনারেলের নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসে এই অভিযান লুসেই অভিযান (Lusrei Expedition) নামে খ্যাত হয়ে আছে। জেনারেল বাউচিয়ার এবং

জেনারেল ব্রাউন্‌-ল উক্ত অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঐ সময় লুসেইরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। মূলত ১৮৬০ সালে লুসেইদের প্রচণ্ড চাপের ফলেই ঐ বৎসর Chittagong Hill Tracts District নামক এই অঞ্চলটি গঠন করা হয়েছিল।

এরপর ধীরে ধীরে লুসেইরা সময়ের আবর্তনে বহুকাল পর্যন্ত শান্তভাবে ব্রিটিশ আমলে জীবন-যাপন করেছিল। তারা খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় তাদের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি দু'টোই উন্নতি লাভ করেছে। লুসেই মেয়েদের 'বাঁশনৃত্য' দিন দিন দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে চলেছে। তাদের পুষ্পনৃত্যও দেখতে খুবই চমৎকার।

এককালে লুসেইরা নিজেদেরকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ে তাদের গ্রামগুলো নির্মাণ করে গ্রামের চারিদিকে শক্ত শক্ত গাছের খুঁটি পুঁতে বেষ্টনী তৈরি করতো। পাহাড় বেয়ে গ্রাম আক্রমণকারী শত্রুদের উপর গড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে বড় বড় পাথরের স্তূপ জমা করে রাখতো। আর রাত্রে যাতে শত্রুরা কোনো প্রকার সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য তারা পথে পথে বেত দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে রাখতো। সেগুলো খালিপায়ে আগত শত্রুদের জন্য একটি সাংঘাতিক বিপজ্জনক বস্তু ছিল। এর উপর প্রবেশ পথে তারা সারাক্ষণ পাহারার ব্যবস্থা করতো। গ্রামের স্বাস্থ্যবান যুবকেরা রাত্রে সশস্ত্র অবস্থায় যাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সদা প্রস্তুত থাকতে পারে সেজন্য তারা খুঁটির উপর মাচাবিশিষ্ট এক জাতীয় বড় ধরনের মাচাঘর 'জলবুক' তৈরি করতো। রাত্রে অধিকাংশ যুবক ঐ জলবুকে ঘুমাতো। বর্তমান জীবনযাত্রা অতীতের জীবনযাত্রা অপেক্ষা কিছুটা নিরাপদ হওয়ায় তারা গ্রামে আর ঐসব সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। পূর্বে কলেরা বা অন্য কোনো মহামারীর সময় বাইরের লোকেরা যাতে গ্রামে প্রবেশ করে কোনো প্রকার সংক্রামক ব্যাধি না ছড়ায় সেজন্য পাংখুয়ারা গ্রামের প্রবেশ পথে গোলপোস্টের মতো একটি পোস্ট তৈরি করে তাতে মুগুর ঝুলিয়ে রাখতো। এর অর্থ হলো প্রবেশ নিষেধ। ঐ সময় গ্রামের ভেতরে তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা-অর্চনাও করতো। তাদের পূজায় শূকর ও মোরগ বলি দেয়া হতো। বর্তমানে এসব প্রথা অবশ্য

লোপ পেতে বসেছে। অতীতে নাগাদের মতো লুসেই ভূমিতেও নরমুণ্ড শিকারের রীতি প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে যুদ্ধ ও আক্রমণ অভিযান পরিচালনার সময় কেউ যদি শত্রু পক্ষের প্রধান ব্যক্তির মাথা কাটতে পারতো, সে সমাজে বিপুল সম্মানের অধিকারী হতো। এটিও বর্তমানে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে। লুসেইরা প্রকৃতই বীরের পূজারী জাতি। অতীতে তারা যদি কোনো বন্য গয়াল, বাঘ বা ঐ জাতীয় বন্য-প্রাণী শিকার করতো তবে তারা, বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ এগুলো তাদের বাড়ির সামনের কক্ষে বেড়াতে ঝুলিয়ে রাখতো।

লুসেইরা তাদের সর্দারদেরকে 'লাল্' বলে। অতীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের গ্রামগুলো পরিচালিত হতো। গ্রামের লোকেরাই সকলে মিলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে 'লাল্' নির্বাচিত করতো। তাঁদের এক একটি গ্রামে এক একজন 'লাল' থাকতেন। এক গ্রামের সাথে আর এক গ্রামের লালের খুব একটা যোগাযোগ থাকতো না। লাল যুদ্ধের সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে গ্রামবাসীদেরকে নেতৃত্ব দিতেন। এছাড়া সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে লালের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে পরবর্তীকালে মিজোরামে সাইলো বংশের নেতৃত্বদানের পর তাদের সমাজেও কিছু কিছু অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল।

অতীতে কোনো লালের মৃত্যু হলে লুসেইরা মৃতের সাথে কবরে অস্ত্রশস্ত্রও মাটি চাপা দিত। এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন লুইন The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein গ্রন্থে ১৮৬৯ সালে লিখেছেন যে, "কোনো পরিবারে প্রধান ব্যক্তির মৃতকে তার শ্রেষ্ঠ পোশাকে সজ্জিত করে ঘরের মধ্যখানে বসা অবস্থায় রাখা হয়। তার ডান হাতে তার বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়া হয় এবং তার স্ত্রী তার বাম পাশে বসে কাঁদতে থাকেন। আত্মীয় ও বন্ধুরা সকলে সমবেত হলে সেখানে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। ভোজের সময় মৃতের সম্মুখে তার জন্য ভাত তরকারি রাখা হয়। উপস্থিত লোকেরা মৃতকে সম্মান জানিয়ে বলে 'আপনাকে বহু দূরে যেতে হবে। আপনি দয়া করে এই খাবারগুলো খান।" এরপর তারা তার পাইপটিতে তামাক পুরে তাতে অগ্নিসংযোগ করে সেটি তাঁর মুখে গুঁজে দেয়। এ সব অনুষ্ঠানের পর তারা যথারীতি মৃতকে কবর দেয়।

খ্যাং

খ্যাং-রা এখানে একটি ক্ষুদ্র উপজাতি। তারা কাপ্তাইয়ের কাছে চন্দ্রঘোনার আশেপাশে এবং রাজস্থলী থানায় বাস করে। এখানে তাদের ৭/৮টি ছোট ছোট গ্রাম আছে। লোকসংখ্যাও কম। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী খ্যাংদের জনসংখ্যা মাত্র ১,৫০১ জন। পূর্বে তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে তাদের অনেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

বার্মায়ও খ্যাংদের বসবাস রয়েছে। সেখানে তারা নিজেদেরকে শো (Sho) বা শু (Shu) বলে। আরাকানি ও বর্মিরা তাদেরকে খ্যাং চিন্ অথবা টেমচিন বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্যাং-রা আরাকান-য়ু-মা-টং পার্বত্য এলাকায় বাস করতো। ঐ সময় তারা বর্মি এবং ইংরেজ উভয়পক্ষের কাছ থেকে দূরে থেকে তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করছিল। ইংরেজরা ১৮২৪ সালে যখন আরাকান অধিকার করে তখনও খ্যাংদের কিছু লোক লেম্রোনদীর তীরে বসবাস করছিল। এই খ্যাংরাই খুমিদের একটা অংশকে আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

খ্যাং-ভাষা ভোট-বর্মি শাখার কুকি-চীন দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা নদীকে 'লং' বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর নামে 'লং' শব্দের ব্যবহার থেকে অতীতে এই অঞ্চলটি খ্যাংদের কাছে পরিচিত ছিল বলে মনে হয়। নিম্নে মিজোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের কয়েকটি লং-যুক্ত নদীর নাম দেয়া হলো :

নদীর নাম	স্থান	
টলং	মিজোরামে	(ধলেশ্বরী নদীর নাম)
আসলং	পার্বত্য চট্টগ্রামে	(উত্তরাংশে প্রবাহিত নদী)
কাসালং	”	”
মাসালং	”	”
কুহলং	”	দক্ষিণাংশে
কামেলং	”	”
ক্যসলং	”	”
হুসলং	আরাকানে	”
ওয়াখালং	”	”

১৮৫৩ সালে B. H. Hodgson এশিয়াটিক সোসাইটির XXII (I) জার্নালে আরাকানস্থ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত খ্যাংদের জনসংখ্যা উল্লেখ করেছেন ১৩,৭০৯ জন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড. গ্রীয়ার্সন Linguistic Survey of India Part I. Vol-I (Calcutta 1927) গ্রন্থে খ্যাংদের জনসংখ্যার যে হিসেবে দিয়েছেন, তা রীতিমতো একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। তাঁর হিসাবে ১৯২১ সালে খ্যাংদের সর্বমোট জনসংখ্যা হলো ৯৫,৫৯৯ জন।

অতীতে এ দেশে আগমন সম্পর্কে খ্যাংদের মধ্যে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। কর্নেল ফেয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটি'র ১১৭ (১৮৪১ ইং) জার্নালে সে বিষয়ে লিখেছেন যে, খ্যাংদের বিশ্বাস, তারা কতগুলো বর্মি শরণার্থীর বংশধর যারা একটি বর্মি সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে পশ্চিম দিকে অভিযান চালানোর সময় অতীতে পার্বত্য এলাকায় হারিয়ে গেছে সাম্প্রতিককালে খ্যাং বংশোদ্ভূত মি: প্রদীপ চৌধুরী, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গিরি নির্ঝর ৩য় সংখ্যায় (১৯৮৩ ইং) 'খিয়াং উপজাতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তাদের এদেশে আগমন সম্পর্কে একই জাতীয় একটি কাহিনী প্রকাশ করেছেন। নিচে তাঁর লেখা কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো "পূর্বে কোনে

এক যুদ্ধে খিয়াং রাজা বার্মা হয়ে এদেশে পালিয়ে আসেন। এদেশে পালিয়ে চলে আসার সময়ই রাজার ছোট রানী ছিলেন অন্তসত্ত্বা। কিন্তু প্রায় তিন চার মাস পর যখন যুদ্ধের অবসান হয়ে গেল, তখন তাদের শুরু হলো ফেরার পালা। সবাই প্রস্তুত ফিরে যাবার জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য ছোট রানীর। একদিকে তার শারীরিক অসুস্থতা, অপরদিকে বড় রানীর প্রতিই ছিল রাজার অধিক দুর্বলতা। রাজা স্থির করলেন ছোট রানীকে ফেলেই তারা চলে যাবেন। সমস্ত কিছুই ব্যবস্থা হলো। রাজা ছোট রানীকে ফেলেই ফিরে গেলেন। .....সেই থেকেই সকলের ধারণা যে, বাংলাদেশে যে সমস্ত খ্যাং উপজাতীয়রা বাস করছে; তারা ছোট রানীরই...।"

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে খ্যাং'রা দেখতে বেশ সুন্দর। কথিত আছে যে, অতীতে প্রায় উপজাতীয় লোকেরা খ্যাংদের আক্রমণ করে তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতো। ইংরেজরা যখন ১৮২৪ সালে বর্মিদের কাছ থেকে আরাকান অধিকার করেছিল তখন তারা আরাকানের পূর্ব দিকের গভীর অরণ্যগুলো থেকে বহু খ্যাং নারীকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এ সমস্ত কারণে অতীতে খ্যাংরা তাদের মেয়েদেরকে অসুন্দর করার জন্য মুখে নানা জাতীয় উল্কি এঁকে দিত। কালে এটি তাদের সমাজে একটি রীতি হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের খ্যাং রমণীরা অবশ্য বর্তমানে মুখে উল্কি আঁকেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে একমাত্র খ্যাংদের গোত্রনামগুলোতে টোটেমিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এখানকার কয়েকটি খ্যাং গোত্রের নাম দেয়া হলো :

১. মিনচ সং (বিড়াল গোত্র)
২. যুংচ সং (বানর গোত্র)
৩. ইউ সং (ইঁদুর গোত্র) ইত্যাদি।

বর্তমানে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক টানাপোড়নে এই ক্ষুদ্র উপজাতীয়টির অবস্থা এখানে প্রকৃতই সঙ্কটজনক। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা খুবই পশ্চাৎপদ। তাই সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের একান্ত কাম্য। বাস্তবিকই তাদের পক্ষে এই উনবিংশ শতাব্দীতে এসে নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

খুমি

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র উপজাতির নাম খুমি। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলার রুমা ও থানচি থানাতে বাস করে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী খুমিদের জনসংখ্যা এ অঞ্চলে মাত্র ১,২৫৮ জন। স্থানীয় লোকদের ধারণা শিক্ষা-দীক্ষা, চাষাবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুন্নত এই উপজাতিটির লোকসংখ্যা ক্রমেই এই অঞ্চলে কমে যাচ্ছে এবং তাদের লোকেরা অনেকেই বার্মার আরাকান অঞ্চলের দিকে চলে যাচ্ছে। উল্লেখ্য আরাকানে কোলাডাইন নদীর উপরাংশে এখনও খুমিদের বসবাস রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ উপজাতীয় লোকদের মধ্যে খুমিরাও অন্যতম। বিগত দু'শত বৎসর ধরে তাদের সম্পর্কে যে সমস্ত রেকর্ডপত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, তারা সমস্ত সময় জুড়েই বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে অথবা আন্ত-খুমি সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এ কারণে তাদের প্রতিটি গ্রাম অতীতে এক একজন সর্দারের নেতৃত্বে সব সময় নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বর্শা, তীরধনুক, ঢাল, ধামা (এক জাতীয় বড় আকারের দা), মাসকেট-বন্দুক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অরাকানের খুমিরা নিজেদের মধ্যে 'কুমি' হিসেবে পরিচিত। সেখানে তাদের দু'দল খুমি রয়েছে। একদল নিজেদেরকে কামি (Kami) বা কিমি (Kimi) বলে এবং অন্যদল তাদেরকে কুমি (Kumi) বলে। আরাকানিরা উপরোক্ত দুটি দলের একটিকে আওয়া কুমি (Awa Kumi) এবং অন্যটিকে আফ্যা কুমি (Aphya Kumi) বলে। উভয় দলই অতীতে কোলাডাইন নদীর

তীরে বসবাস করতো। B. H. Hodgson এশিয়াটিক সোসাইটির Vol-XIII (I) জার্নালে ১৮৫৩ সালে আরাকানস্থ খুমিদের লোক সংখ্যার হিসেব দিয়েছেন ৪,১২৯ জন।

খুমিরা ঐখানে ম্রোদের সাথে এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খুমি-ম্রো সংঘর্ষে পরে তাদেরই জয় হয়। তারা ঐখান থেকে ম্রোদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের এলাকা দখল করে বসে। পরে নিজেরাই সেখানে তাদের চেয়ে শক্তিশালী খ্যাংদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে একটু একটু সরে আসতে থাকে। এমতাবস্থায় খুমি সর্দারের মধ্যে আন্ত-খুমি সংঘর্ষ শুরু হলে খুমি-সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে।

অতীতে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা বান্দরবানের জনৈক ধাবাংগ্যি নামক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন সর্দারের নেতৃত্বে বমদের একটি গ্রাম আক্রমণ করে বম সর্দার লিয়ানকুং-এর জনৈক পূর্বপুরুষের কবর লুণ্ঠন করেছিল, এই অজুহাতে ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে বম সর্দার লিয়ানকুং কুমিসর্দার হ্লোংক্রেইং-এর গ্রাম আক্রমণ করে ৩০/৪০ জন লোককে হত্যা করেন এবং খুমি সর্দারের একটি কন্যাসহ ৩৮ জন স্ত্রীলোককে শিশুসহ ধরে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন। পরে অবশ্য চট্টগ্রামস্থ ইংরেজদের মধ্যস্থতায় তিনি ৩৩ জনকে ফেরত পাঠান। বাকিদের মধ্যে ২ জনকে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং ৩ জনকে অন্য একটি উপজাতির কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল।

এ সমস্ত ঘটনার কারণে খুমিদের কিছু লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে তাদের বর্তমান আবাসস্থলে চলে আসে। তবে তাদের মধ্যে এখানে আসার বহুদিন পরেও যুদ্ধংদেহী মনোবৃত্তি ছিল। আর এখনও তার নাচের আসরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'যুদ্ধবিজয় নৃত্য' পরিবেশন করে। খুমি পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং মাথার পিছন দিকে ঝুঁটি আকারে বাঁধে। তারা মাথায় সাদা কাপড় দিয়ে পাগড়িও বাঁধে। খুমিদের ভাষা কুকি-চিন দলের অন্তর্ভুক্ত। নাচের আসরে তারাও ম্রোদের মতো গো-হত্যা করে এবং ম্রো

বাঁশী 'পুং' বাজায়। তবে তারা গো-হত্যা অনুষ্ঠানে নাচের সময় ম্রোদের মতো দলবদ্ধ হয়ে নাচে না। এক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেচে থাকে।

বর্তমানে বান্দরবানে বসবাসকারী খুমিদের অবস্থা ভালো নয়। তারা খুবই গরিব, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবস্থান একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। মূলত যাযাবর মনোবৃত্তি ও জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু তাদের এই দুরবস্থা। তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে হলে বহু প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার প্রয়োজন হবে।

চাক

চাকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলায় বাইশারি, নাক্ষ্যংছড়ী, আলিখ্যং, কোয়াংঝিরি, কামিছড়া, ক্রোক্ষ্যং প্রভৃতি মৌজাগুলোতে বাস করে। এখানে তাদের জনসংখ্যা কম। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি অনুযায়ী চাক পরিবারগুলোর যে হিসেব পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯৬০ জন। প্রকৃতপক্ষে তাদের জনসংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি বলেই অনেকে মনে করেন।

চাকরা নিজেদেরকে 'আসাক' বলে। তবে আরাকানিরা চাকদেরকে 'সাক' বলে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আরাকানের আকিয়াব জেলায় চাকদের বেশ কিছু লোক 'সাক' নামে বসবাস করছে। বার্মায় কাডু (Kadu) এবং গানান (Ganan) নামে চাকদের সমগোত্রীয় আরও দু'টি উপজাতি রয়েছে, তারাও চাকদের মতো নিজেদেরকে আসাক (Asak) বলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকদের দুটি প্রধান গোত্র রয়েছে। এগুলো হলো আন্দো এবং ঙারেক। চাক সমাজে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে গোত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের রীতি অনুযায়ী চাকদের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। একজন আন্দো-ছেলের পক্ষে একজন আন্দোমেয়ে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। রীতি অনুযায়ী একজন আন্দো-ছেলেকে বিয়ে করতে হবে একজন ঙারেক মেয়ে। একইভাবে একজন ঙারেক ছেলেও একজন ঙারেক মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। তাকে বিয়ে করতে হবে একজন আন্দো-মেয়েকে।

এ নিয়ম শুধু বিয়ের বেলায় নয়, মৃত্যুর বেলাতেও প্রযোজ্য। আন্দো গোত্রের কোনো লোক মারা গেলে তার মরদেহ রীতি অনুযায়ী দাহ বা সৎকার করার ভার পড়বে ঙারেক গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাগ্নেদের উপর।

লোকটি যদি আন্দো গোত্রের কোনো লোকের স্ত্রী হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রেও তার মরদেহ দাহ করবে ঙারেক গোত্রে অবস্থানকারী তার ভাইপোরা। আবার ঙারেক গোত্রের কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক মারা যায় তবে এক্ষেত্রে তাদের মরদেহ দাহ বা সৎকার করার ভার পড়বে আন্দো গোত্রস্থিত তাদের ভাগ্নে বা ভাইপোদের উপর।

চাকদের ইতিকথা সম্পর্কে ড. জে. এ. গ্রীয়ার্সন তাঁর Linguistic Survey of India (Vol-1, Part-I Calcutta 1927) গ্রন্থে জনৈক টেইলরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, বর্মিদের মতে অতীতে সাক জাতি (চাক জাতি) বার্মার ইরাওয়াদী (ইরাবতী) নদীর উপরাঞ্চলে বাস করতো। কোনো এক সময় এদের একটি দল তাদের আদি-নিবাস ছেড়ে উত্তর বার্মা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরাকানে প্রবেশ করে। টেইলরের মতে সাকদের একটি অংশ মণিপুরে যায় এবং তাদের বংশধরদের কাছ থেকে পরবর্তীকালে সেখানে আন্দ্রো ও সেংমা উপজাতির জন্ম হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মণিপুরীদের মধ্যেও চাকদের মতো আন্তঃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। আর এখনও মণিপুরীদের মধ্যে আন্দ্রো নামে একটি গোষ্ঠী রয়েছে যার নামের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকদের আন্দো গোত্রের নামগত মিল রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে মং মং চাক রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক পত্রিকা গিরিনির্ঝর, ১ম সংখ্যায় ১৯৮২ সালে 'চাক উপজাতি পরিচিতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে চাকদের এখানে আগমনের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, নিচে তার সারাংশ দেয়া হলো :

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরাকানে যখন রাজা মাংথি রাজত্ব করছিলেন তখন চাকরা উত্তর বার্মায় মিছাগিরি নামক রাজ্যে বাস করতো। ঐ সময় চাকদের রাজার নাম ছিল য়েংচো। আরাকান রাজ চাকরাজ্য দখলের জন্য ফন্দি করে নিজের ভগ্নী রাজকুমারী ব্রাহমীর সাথে চাকরাজার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চারজন সেনাপতির নেতৃত্বে চার দল সৈন্য পাঠালেন। প্রত্যেক সেনাপতির হাতে বিশেষ একটি চিঠির অনুলিপি দেয়া হলো এবং তারা প্রত্যেকে এক একজন সুন্দরীকে আরাকান রাজার ভগ্নী পরিচয়ে সঙ্গে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য এই যে, যিনিই চাকরাজা য়েংচো-র কাছে আগে যান না কেন

তিনিই তাঁর সঙ্গে নেয়া সুন্দরীকে আরাকানরাজার ভগ্নী হিসেবে চালিয়ে দেবেন। ৬৯৫ মঘীর (১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দের) বর্মি তাপোথায় মাসের ১২ তারিখ বিবাহের রাত্রে কনেপক্ষরূপী ছদ্মবেশী আরাকানী সৈন্যরা চাকরাজা য়েংচোকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে অতর্কিতে আক্রমণ করে সহজেই সপরিবারে বন্দী করে ফেলে। চাক রাজার তিন রানী, দুই কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ দুই রাজপুত্রও আরাকানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। জ্যেষ্ঠপুত্র চোচুং তাঁর অনুগত সৈন্যদের নিয়ে মিছাগিরির পূর্বদিকে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে আরাকানরাজ চাক রাজকুমারী চোমেখ্যাইনকে বিয়ে করেন এবং চাক রাজপরিবারের সকলকেই নানা মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। মধ্যম রাজপুত্র চোপ্রুমিঙ রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠ রাজপুত্র চোতুং কাঙ রাজ্যের শাসনভার লাভ করেন। যুদ্ধে বন্দী চাক প্রজাদেরকে এঙ এবং রো নামক দু'টি নদী তীরে পুনর্বাসিত করা হয়। পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ রাজপুত্র চোতুং তার প্রজাদের নিয়ে চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে পালিয়ে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

উল্লিখিত আরাকান-সাক যুদ্ধ সম্পর্কে ১৯০৯ সালে শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ দেঙ্গাওয়ার্দী আরেদ ফুং নামক একটি আরাকানি ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে মিঃ মং মং চাকের মতো একই কাহিনী লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে সাকরাজাকে চাকমারাজা হিসেবে স্থান দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে সাকরাজার নাম ইয়ংজ, সাকদের রাজধানীর নাম মইচাগিরি হিসেবে তিনি লিখেছেন।

সাম্প্রতিককালে শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান এ বিষয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ১৩৩৩ সালে সাকদের রাজা মূলত শান বংশীয় রাজা উ-য-না (U-za-na)। যাঁর নাম আরাকানিদের ইতিহাসে বিকৃত হয়ে য়েংচো বা ইয়ংজ হয়েছে। শানরাজা উ-য-নার রাজধানী ছিল ম্যইন-সইং (Mym-saing) এ। এটি আরাকানিরা মিছাগিরি বা মইচাগিরি লিখেছেন। শাসনরাজা উ-য-নার পূর্বে সেখানে তিন জন শানরাজপুত্র রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের সকলের ছোট ভাইয়ের নাম ছিল থি-হ-থু (Thi-ha-thu-Ta-tsi-sheng)। থিহথুকেই আরাকানিরা চৌতু বা চৌতুং লিখেছেন।

এর ফলে নতুন যে প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে তা হলো চাক (সাক) দের সাথে শানদের অতীতে কোনো প্রকার যোগাযোগ হয়েছিল কিনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত ততদিন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর চাকদের কিছু আচার অনুষ্ঠানের কথায় আসা যাক। প্রথমে জন্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের কথা এসে পড়ে। কোনো গৃহে শিশুর জন্ম হলে, তাকে প্রথমে স্নান করানো হয়। এরপর একটি পাত্রে ভাত ও পানি এবং সেগুলোর উপর একটি জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে ঐটিকে আঁতুড় ঘরে নিয়ে আসা হয়। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক ঐখানে প্রথমে একটি আঙ্গুল ডুবায় এবং তা নবজাতকের হাতে ও পায়ে স্পর্শ করায়। ফলে ঐ পাত্রের ভাত ও পানি বাইরে ফেলে দেয়া হয়।

সাধারণত প্রসূতিকে ৮/১০ দিন আঁতুড় ঘরে থাকতে হয়। এরপর যেদিন তাকে এর বাইরে নিয়ে আসা হয়, ঐদিন তার দেহে 'পবিত্র-জল' ছিটানো হয়। এতে ভবিষ্যতে তার রোগব্যাধি কম হবে বলে বিশ্বাস। এরপর নামকরণের পালা। অনেকে মনে করেন নবজাতক তাদের মৃত পূর্ব পুরুষদের কেউ না কেউ মৃত্যুর পরে নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে জ্যোতিষ ডেকে মৃত পূর্ব পুরুষের নামানুসারে শিশুটির নাম রাখা হয়। তবে ঘরের প্রথম ছেলের বেলায় নামের আগে বা পরে 'উ' যুক্ত করা হয় ; আর কনিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে একইভাবে 'থুই' যুক্ত করাই রীতি। শিশুর নামকরণের দিন তার আত্মীয়েরা তাকে টাকা এবং কাপড়-চোপড় দিয়ে আশীর্বাদ করে। এই অনুষ্ঠানকে চাক ভাষায় 'ভেগলংশাক' বলা হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নামকরণের দিনই শিশুর জন্য প্রথম দোলনা তৈরি করা হয়। শিশুটি বড় হলে তাকে বহির্গোত্রের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হয়। বিয়ের সময় সচরাচর বর কনে উভয়ের জন্ম দিনের কোষ্ঠী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় ; এরনাম 'জাদা'। বর যাত্রার সময় বর পক্ষের সাথে সব সময় আন্দো গোত্রের দুজন যুবক-যুবতী এবং ঙারেক গোত্রের দুজন যুবক-যুবতী সাথে নিতে হয়। বিয়েতে বেশ খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়।

বিয়ের বছর খানেক পরে প্রথম সন্তানসহ মেয়েরা বাপের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বেড়াতে যায় এবং ঐ সময় তারা পিতামাতার কাছে তাদের

সম্পত্তির ভাগ চায়। সচরাচর তাদের পিতামাতা তাদেরকে টাকা-পয়সা, গরু-মহিষ, অলঙ্কারপত্র ইত্যাদি দিয়ে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাকরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধদের প্রায় অনুষ্ঠানগুলো তারা শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করে। কোনো গৃহে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তারা ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করে এবং এরপর বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতির জন্য সাত দিন ধরে ভাত দান করে ; সেখানে বুদ্ধের কাছে তার আত্মার সদগতি কামনা করে প্রার্থনা জানায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরা জনসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র উপজাতি হলেও বর্তমানে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে দুজন বি. এ. পাশ করেছে এবং তাদের বেশ কয়েকজন বিভিন্ন ছোট-বড় সরকারি চাকুরিতে ঢুকেছে।

গারো

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে গারোরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপজাতি। তারা এখন ময়মনসিংহ ছাড়াও টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলাতে বসবাস করে। এখানে হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী, কমলাকান্দা, বিরিশিরি, বারহাট্টা, মধুপুরের গড় ইত্যাদি স্থানে গারোদেরকে অধিক সংখ্যায় বসবাস করতে দেখা যায়। গারোরা সীমান্তের অপর পারে ভারতের মেঘালয়, কোচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি রাজ্যেও রয়েছে। তবে মেঘালয় রাজ্যেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। মূলত ব্রিটিশ আমলে ঐ অঞ্চলের একাংশ The Garo Hills District হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯২১ সালে গারোদের লোকসংখ্যা ছিল ২,১৬,১১৭ জন।

পণ্ডিতদের মতে গারো এবং তাদের সমভাষী আসামের বোড়ো (Bodo) উপজাতীয় লোকেরা খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে তাদের আদি নিবাস ছেড়ে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যের দিকে এসেছিল। এ বিষয়ে B.C. Allen, Assam District Gazetteer., B.C. Vol–X (1906) গ্রন্থে লিখেছেন যে, অতীতে গারো এবং বোড়ো ভাষী অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরা চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপরাংশ থেকেই ভারতের উত্তরপূর্বাংশের আসাম রাজ্যে এসেছিল।

মণীন্দ্রনাথ মারাক, বিধি পিটার দাংগো, সুভাস জে, সাংমা এবং আলবার্ট মানকিন এই চারজন গারো–লেখক সাম্প্রতিককালে 'বাংলাদেশ আদিবাসী উপজাতি কল্যাণ সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত মাটির মানুষ (১৯৮২ ইং) গ্রন্থে গারোদের ইতিকথা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ

করেছেন, "গারোরা মঙ্গোলীয় জাত গোষ্ঠীর বৃহৎ বোড়ো (Bodo) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি তাঁর নেচারাল হিস্ট্রিতে গারোদের মান্দাই বলে উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী পাটলিপুত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করবার সময়ে গারো পাহাড়কে উমর পুজ এবং এর অধিবাসীদের গারিওনি বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। গারিওনি গারো নামের অপভ্রংশ। ঐতিহাসিকভাবে টলেমীই সর্ব প্রথম গারো নামের উল্লেখ করেছেন।" গারোদের নাম নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত। এ বিষয়ে মণীন্দ্রনাথ মারাক, বাংলাদেশ পরিষদের 'গারো সংস্কৃতি' (১৯৭৭ ইং) নামক একটি গ্রন্থে লিখেছেন, "গারো নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। তিব্বতের গারু নামক প্রদেশে তাহারা বাস করিত বলিয়া তাহারা গারো নামে পরিচিত হইয়াছে। এই অঞ্চল বর্তমানে তিব্বতে গিয়ারুং কিম্বা গারটক স্থান কিনা তাহা গবেষণা সাপেক্ষ। কাহারো কাহারো মতে গারো উপজাতির একটি উপদল গারো গানচিং হইতে গারো নামের উদ্ভব হইয়াছে।" এখানে উল্লেখ্য যে, The Garos (London 1904) গ্রন্থের লেখক Major A Playfair উল্লিখিত শেষোক্ত মতটির সমর্থক। তাঁর মতে গারোরা সব সময়ই নিজেদেরকে আচিক (পার্বত্যবাসী), মান্দি (মানুষ) অথবা আচিক মান্দি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'আচিক' শব্দটির মৌলিকত্বের উপর জোর দেয়ার পক্ষপাতি।

গারো সমাজে বেশ কয়েকটি দল-উপদল রয়েছে। এগুলো পেশা ও এলাকা ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। নিম্নে এগুলোর নাম দেয়া হলো : ১. আবেং, ২. দোয়াল, ৩. বাবিল, ৪. আত্তং, ৫. মাৎছি, ৬. চিবক, ৭. রুগা, ৮. আউই, ৯. কৎচু, ১০. মিগাম, ১১. গারা গানচিং, ১২. ব্রাক, ১৩. চিসাক, ১৪. জারিয়াং, ১৫. রাতাবেং, ১৬. নেংক্রা এবং ১৭. আতি-আগ্রা।

গারো সমাজে গোত্রের প্রতিশব্দ হলো মাচং/মাছং বা মাহারী। তাদের সমাজে মায়ের পরিচয়েই ছেলেমেয়েদের গোত্র পরিচয় হয়ে থাকে। মূলত তাদের গোত্রগুলো মাতৃতান্ত্রিক গোত্র। এ জাতীয় গোত্রের সংখ্যা তাদের মধ্যে প্রায় শতাধিক যেমন : রেমা, চিসিম, দাওয়া, রাংসা, আসাক্রা, রিছিল, রাংমা,

মাংসাং, বাংশিল, রংগী ইত্যাদি। এদের মধ্যে আবার ৫টি প্রধান প্রধান দল রয়েছে, এগুলোকে 'চাচ্ছি' বলা হয়। এগুলো হলো : ১. সাংমা, ২. মারাক, ৩. মমিন, ৪. শিরা এবং ৫. আরেং। এ সব নামগুলো পদবি হিসেবেও গারো সমাজে ব্যবহৃত হয়। আর এ সব পদবির বিশেষ একটি বিশেষত্ব হলো, গারো সমাজে একই পদবিধারী বা একই গোত্রের দুজন ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। তাদেরকে বিয়ে করতে হয় ভিন্ন পদবিধারী ব্যক্তি বা গোত্র থেকে।

সামাজিক কাঠামো ও ধর্মবিশ্বাস

গারোদের সামাজিক কাঠামো মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। তারা গ্রাম্য প্রধানকে 'নকমা' বলে। অতীতে জুমচাষের ব্যাপারে এক একটা অঞ্চলের উপর এক একজন নকমার অধিকার থাকতো। পূর্বে গারোদের বিশ্বাস ছিল যে, তাতারা রাবুগা নামক একজন স্রষ্টা অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় এই মহাবিশ্ব ও প্রাণিজগতের সৃষ্টি করেছেন। তারা আত্মার অবিনাশিকতায় এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতো। বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে চিন্তার জগতে নতুন ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ

জন্ম : শিশুকে জন্মের পর উষ্ণজলে স্নান করানো হয়। কোনো প্রকার অপদেবতা যাতে শিশুটির অনিষ্ট সাধন করতে না পারে সেজন্য বাড়ির দরজায় জাল, ঘরের মধ্যখানে অগ্নিকুণ্ড এবং শিয়রে দুর্গন্ধযুক্ত পচাপাতা রাখা হয়। শিশুটির জন্মের দিন পূর্বে প্রস্তুতকৃত জীবন মদ (চুজাংগি) বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা পান করে। ঐ মদ পানের পর ঐদিন তারা আর কোনো কাজ করে না।

নামকরণ : গারোদের রীতি অনুযায়ী শিশুর জন্মের সাত দিন পরে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান মতে শিশুর নামকরণ করা হয়। সচরাচর পূর্বপুরুষদের নামানুসারে শিশুর নামকরণ করতে গারোরা পছন্দ করে। পরিবারের প্রথম সন্তানের বেলায় শিশুটির নামকরণে তার পিতার বা মাতার

নাম তার নামের পূর্বে যোগ করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে মণীন্দ্রনাথ মারাক একটি উদাহরণ দিয়েছেন—পিতার নাম যদি 'আচং' এবং তাঁর প্রথম সন্তানের নাম যদি 'চিরে' হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার পরিচয় হবে আচং-চিরে।

মৃত্যু : কোনো গারো মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজনেরা খবর নিতে গেলে প্রত্যেকে রীতি অনুযায়ী তার জন্য একটি কাপড় সাথে করে নিয়ে যায়। তারা রীতি অনুযায়ী মৃতদেহকে দাহ করে। তবে কেউ কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে সেক্ষেত্রে তারা তাকে কবর দেয়। অতঃপর মৃতব্যক্তির আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে 'নকালচিকা', 'মিবাংকালা-দেলাং সওয়া' ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করে।

বিবাহ : গারো-সমাজে বিয়ের বেলায় গোত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের সমাজে একই মাহারীতে (গোত্রে) দুজন ছেলেমেয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন সাংমা-ছেলে একজন সাংমা-মেয়েকে অথবা একজন মারাক-ছেলে একজন মারাক-মেয়েকে রীতি অনুযায়ী বিয়ে করতে পারে না, তাকে বিয়ে করতে হবে ভিন্ন মাহারী (গোত্র) থেকে। এ দিক থেকে গারো-সমাজে বহির্গোত্রেই বিয়ে করার নিয়ম প্রচলিত।

এ বিষয়ে আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যে, গারোসমাজে মেয়েরাই পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। ছেলে বা পুরুষদের পারিবারিক সম্পত্তিতে কোনোই অধিকার নেই। সাধারণত মায়েরাই তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁদের মেয়েদেরকে বিশেষত সর্বকনিষ্ঠ কন্যাদেরকে তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী (নকনা) নির্বাচিত করেন। এই নকনার স্বামীকে 'নক্রম' বলা হয়। নক্রমকে অবশ্যই নকনার আপন পিসতুতো ভাই হতে হয়। গারো সমাজে এই নকনা-নক্রম বন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সচরাচর অভিভাবকেরাই বিয়ের যোগ্য পাত্রপাত্রীদেরকে নির্বাচিত করেন। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেলে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীদেরকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাদের রীতি অনুযায়ী বিয়েতে অতিথিদেরকে উপহার (আজৎ) নিয়ে যেতে হয়। চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, পিঁয়াজ, হলুদ, মশলা, পান, সুপারি ইত্যাদি 'আজৎ' হিসেবে উপহার দেয়া হয়।

অনেকে সামর্থ অনুযায়ী তৎসঙ্গে ছাগল, শূকর অথবা মোরগও নিয়ে যায়। গারোদের রীতি অনুযায়ী তাদের বাড়িতেও বিয়ের সময় বর্তমান নিমন্ত্রণকারীকে সমপরিমাণ উপহার নিয়ে যেতে হয়। এটাকে তারা 'গান্দাবারা' বলে।

গারোদের বিয়েতে যথেষ্ট আমোদফুর্তি ও খানাপিনা চলে। বিয়েতে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। 'কামাল' রাই বিয়েতে পৌরোহিত্য করেন এবং বর ও কনের বিয়ে দেন। অতঃপর উপস্থিত আত্মীয়স্বজনেরা তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

উৎসব : গারোদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম 'ওয়ানগালা'। বাংলা আশ্বিন মাসে তিন থেকে সাত দিন ধরে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তখন গারো জনপদগুলো আনন্দ-উৎসবে উদ্বেলিত ও মুখরিত হয়ে ওঠে।

খাসি

খাসিরা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বাস করে। এখানে তাদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে–১. খিনরিয়াম, ২.প্লার বা সিন্তেং এবং ৩. ওয়ার। উপরোক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহত্তর সিলেট এলাকায় প্লার বা সিন্তেংদের সংখ্যাই অধিক। পি, প্রেনটিস, 'মাটির মানুষ' (১৯৮২ ইং) গ্রন্থে 'খাসি উপজাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে এখানে তাদের জনসংখ্যা তের/চৌদ্দ হাজারের মতো বলে উল্লেখ করেছেন। খাসিদের মূল জনসংখ্যাটি রয়েছে সীমান্তের অপর পারে The Khasi and jaintia Hills District–এ । এটি এখন মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। P. R. G. Mathur তাঁর লিখিত Khasi of Meghalaya (Delhi 1979) গ্রন্থে সেখানে খাসিদের জনসংখ্যা ১৯৬১ সালে ৪,৬২,১৫২ জন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন।

খাসিরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের ভাষা বৃহত্তর অস্ট্রিক পরিবারের মন–ক্ষেমর শাখার অন্তর্গত। সিলেটের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তারা পানের চাষ করে। তবে সীমান্তের অপর পারের খাসিরা উন্নতমানের কমলার চাষও করে থাকে। শিলং শহরে খাসি–মেয়েরা বেশ দক্ষতার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যও করে।

পূর্বে তারা জড়ের উপাসনা করতো, দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছাগল, মোরগ ইত্যাদি বলি দিত। তাদের মধ্যে পূর্ব–পুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা করাও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে বিশেষত পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পারিবারিক জীবনে খাসিরা গারোদের মতোই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী। তাদের সমাজেও মেয়েরাই যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের কোনো কোনো সম্প্রদায়র মধ্যে মেয়েরা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ের পর বাড়িতে দু'এক বছরের জন্য নিয়ে আসে। তবে সিন্তেংদের মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু পার্থক্য রয়েছে। B. C. Allen, Assam District Gazetteer, Vol-X (1906) গ্রন্থে খাসিদের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা মতে খাসিদের বিয়ের সময় দুটি লাউয়ের খোলে রক্ষিত মদ ঢেলে একটি পাত্রে মিশ্রিত করা হয় ; এটি তাদের দুপক্ষের (বর ও কনের) মিলনের প্রতীক। বিয়ের পর মেয়েরা সচরাচর মা-বাবার সাথে একই বাড়িতে থাকে। তবে তারা সন্তান হওয়ার পর স্বামীর সাথে ঘর করতে চলে যায়।

অনেক সময় তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে ৫টি কড়ি বা তাম্রমুদ্রা দেয়। স্ত্রী আরও ৫টি কড়ি বা তাম্রমুদ্রাসহ ওগুলো তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দেয়। এরপর স্বামী ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এতে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

হাজং

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় গারোদের পাশাপাশি হাজং উপজাতীয় লোকেরাও বাস করে। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আর তাদের ভাষার সাথে বাংলা ও অহমীয়া ভাষারও মিল দেখা যায়। স্বল্প সংখ্যক হাজং ময়মনসিংহ ছাড়াও জামালপুর এবং সিলেট অঞ্চলে রয়েছে। ১৯৫১ সালে এখানে তাদের জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারের উর্ধ্বে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা ঘটনার ফলে কমতে কমতে তাদের জনসংখ্যা বর্তমানে মাত্র ৬,১৬৮ জনে এসে দাঁড়িয়েছে (স্বর্ণকান্ত হাজং ও নিখিল রায়, হাজং ইতিবৃত্ত, মাটির মানুষ ১৯৮২ দ্রঃ)।

হাজংদের ইতিকথা সম্পর্কে উল্লিখিত দুজন লেখক লিখেছেন যে, "চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর কামরূপ রাজ্য বিবরণীতে হাজো নগরের উল্লেখ আছে। হাজো নগর থেকে উদ্ভূত বলে তখন থেকে ঐ সমস্ত লোকেরা হাজোন হাজন এবং শেষে হাজং নামে পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে আবাসভূমির তাগিদে হোক—রাষ্ট্র বিপ্লবাদিতে হোক কিংবা দেশ জয়ের নেশা অথবা শক্তিশালী কারো দ্বারা তাড়িত হয়েই হোক, হাজংগণ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ডেল্টনের মতে আসামের হোজাই হাজংদের আদি বাসভূমি। এণ্ডেল-এর মতে হাজং কাছারী শব্দ ; অর্থ পাহাড়-পর্বতের অধিবাসী।"

হাজংরা গারোদের পাশাপাশি থাকলেও তারা গারোদের মতো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিবাসী নয়, তাদের সমাজ-ব্যবস্থা মূলত পিতৃতান্ত্রিক। অতীতে বিভিন্ন স্থানীয় রাজারা তাদের উপর বহু অত্যাচার করেছিল। ১৮৯৩ সালে হাতি খেদাকে কেন্দ্র করে হাজংরা বিদ্রোহ করতে

বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহ ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। স্থানীয় রাজা হাজং সর্দারদেরকে বিভিন্ন তালুক ছেড়ে দিয়ে তবেই বিদ্রোহ থামাতে পেরেছিলেন। ১৯৫০ সালেও তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ঐ সময় পাকিস্তান সরকার কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করেন। এতে বহু হাজং ভারতে চলে যায়।

এখানে যারা থেকে যায় তারা দিন দিন নানা অভাব-অনটনের শিকার হয়ে পড়ে। তাদের জমিজমাও খুব একটা নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা ভীষণভাবে পশ্চাৎপদ। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মাত্র ২জন হাজং বি. এ. পাশ করেছেন এবং ঐ বৎসর আরও ৮ জন ছাত্র কলেজে পড়ছিলেন। এই অবস্থায় তাদেরকে ভূমি-বন্দোবস্তি, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ কারিগরি ও কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ দিলে তাদের উপকার হবে বলে অনেকেরই বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জি

১. চাকমা জাতি, সতীশচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা, ১৯০৯ ইং

২. চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, রাজা ভুবনমোহন রায়, রাঙ্গামাটি, ১৯১৯ ইং

৩. রাজনামা, মাধবচন্দ্র চাকমা, চট্টগ্রাম, ১৯৪০ ইং

৪. পার্বত্য রাজলহরী, নোয়ারাম চাকমা, রাঙ্গামাটি, ১৯৬২ ইং

৫. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, বিরাজমোহন দেওয়ান, রাঙ্গামাটি, ১৯৬৯ ইং

৬. চাকমা পরিচিতি, সুগত চাকমা, রাঙ্গামাটি ১৯৮৩ ইং

৭. *History of Burma*, Sir Arthur P. Phayre. London,1883

৮. *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein.* Captain T. H. Lewin, Calcutta 1869

৯. *A Fly on the wheel.* London, 1912

১০. *An Account of Chittagong Hill Tracts.* R. H. S. Hutchinson, Calcutta 1906

১১. *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer. 1909*

১২. *The Tribes of Chittagong Hill Tracts.* A. b. Rajput, Karachi 1963

১৩. *Tribal History of Eastern India.* E. T. Dalton, Calcutta, 1872

১৪. T*ripura--Its people and history.* Omesh Saigal, Delhi 1978

১৫. *the Mizo Unrest.* Dr. B. B. Goswami, Jaipur, 1979

১৬. *The North East Forntier of India.* A Mackenzie, Delhi 1889

১৭. *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts.* Pierre Bessaignet, 1958.

সুগত চাকমার জন্মস্থান ও জন্মতারিখ : রাঙ্গামাটি, ২৪ মার্চ ১৯৫১। স্থায়ী ঠিকানা : রাঙ্গামাটি কলেজ গেইট, পশ্চিম কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি। বর্তমান ঠিকানা : উপ-জাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, কক্সবাজার। শিক্ষা : স্নাতকোত্তর (পদার্থ-বিজ্ঞান) : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৬)। পেশা : চাকরি। সহকারী পরিচালক, উপ-জাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি। বর্তমান গ্রন্থ ব্যতীত তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : চাকমা পরিচিতি (১৯৮৩) ; পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা (১৯৮৮) ; চাঙমা বাঙলা কথাতারা (চাকমা বাংলা অভিধান), (১৯৭৩) ; রংধং (চাকমা কবিতার বই) রাঙ্গামাটি (জুভাপ্রদ) (১৯৭৮), চাকমা পরিচিতি (রাঙ্গামাটি বরগাঙ : পাবলিকেশন্স) (১৯৮৩); পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি (১৯৯৩), প্রকাশিকা : ধীরা খীসা, রাঙ্গামাটি। চাকমা রূপকথা (১৯৯৫), বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ঢাকা। নাটক : খৈঙাবৈদ্য (চাকমা ভাষায় রচিত) (১৯৭৮) ; নীলমোন সবন (নীল পাহাড়ের স্বপ্ন) (১৯৭৯)।

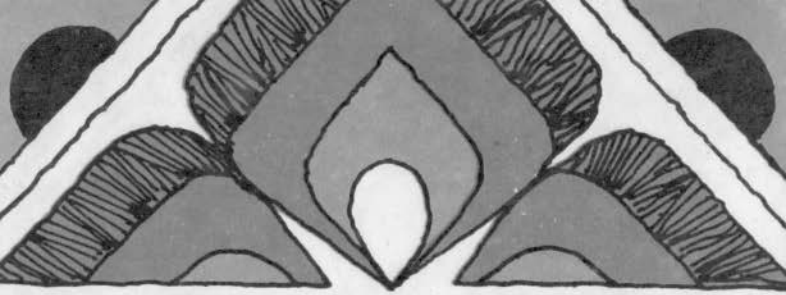

.....এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে।.....
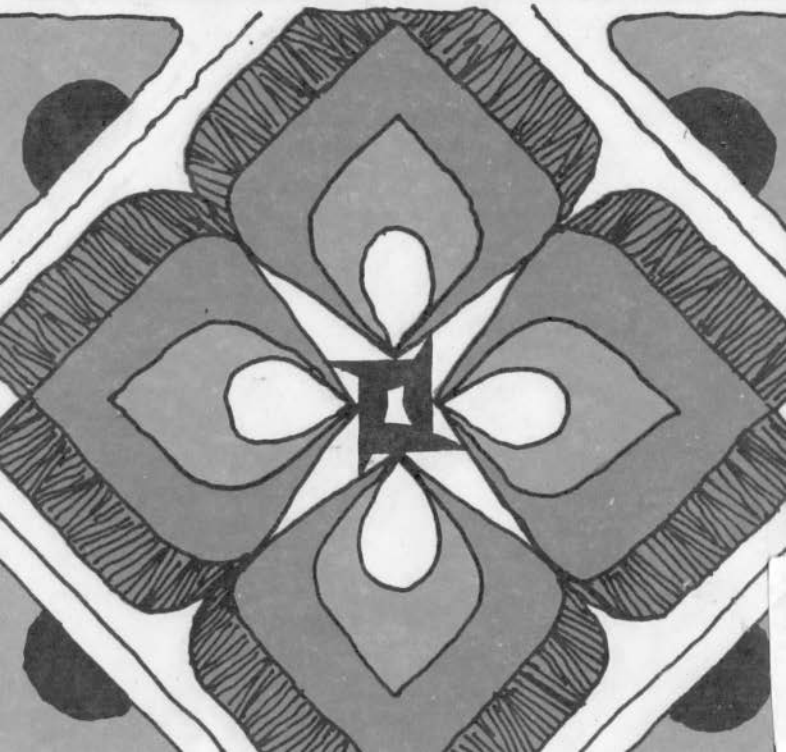
বহু উপজাতির বাস এ দেশে। তাদের জীবনযাপন অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এরা কারা? কেমন এদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, জীবনাচরণ? এসব বিষয় নিয়ে এ বই।